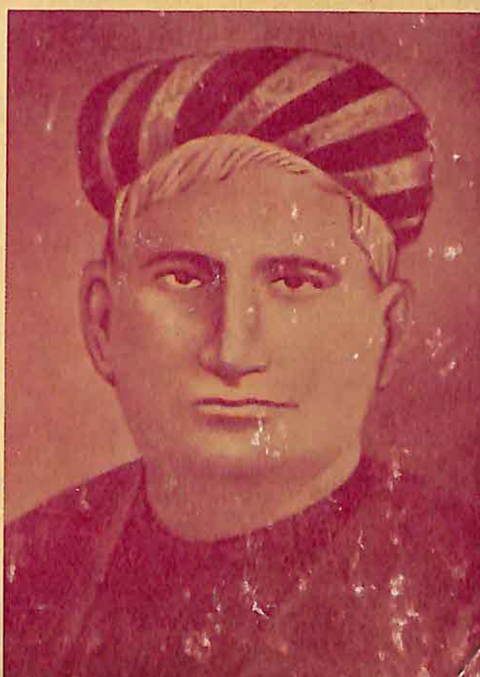
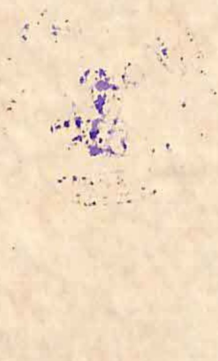
ছোটদের বঙ্কিম গ্রন্থমালা

ইন্দিরা

সাহিত্যসম্রাট
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী
কলিকাতা-১২



ছোটদের বঙ্কিম গ্রন্থমালা

সাহিত্যসম্রাট
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

ইন্দিরা



সম্পাদনা শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর
পরিকল্পনা শ্রীপ্রহ্লাদ প্রামাণিক

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী
কলিকাতা · ১২

ছোটদের সংস্করণ :
প্রথম প্রকাশ : জুন '৫৪

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

ছবি এঁকেছেন :
শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস লিমিটেড
১৫।এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা-৬

দাম :
এক টাকা

ইন্দিরা



প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি শ্বশুরবাড়ী যাইব

আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতে ছিলাম। আমি উনিশ বৎসরে পড়িয়াছিলাম, তথাপি এ পর্যন্ত শ্বশুরের ঘর করি নাই। তাহার কারণ, আমার পিতা ধনী, শ্বশুর আমাকে

লইতে লোক পাঠাইয়া ছিলেন, কিন্তু পিতা পাঠাইলেন না ;—বলিলেন, বিহাইকে বলিও যে, আগে আমার জামাতা উপার্জন করিতে শিখুক—তার পর বধূ লইয়া যাইবেন—এখন আমার মেয়ে লইয়া গিয়া কি খাওয়াইবেন ? আমার স্বামীর বয়স তখন কুড়ি বৎসর,—তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, স্বয়ং অর্থোপার্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিবেন। এইভাবিয়া তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। তখন রেইল হয় নাই—পশ্চিমের পথ অতি দুর্গম ছিল। তিনি পদব্রজে, বিনা অর্থে, বিনা সহায়ে সেই পথ অতিবাহিত করিয়া, পঞ্জাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে ইহা পারে, সে অর্থোপার্জন করিতেও পারে। স্বামী অর্থোপার্জন করিতে লাগিলেন—বাড়ীতে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন—কিন্তু সাত-আট বৎসর বাড়ী আসিলেন না, বা আমার কোন সংবাদ লইলেন না। কিন্তু যে সময়ের ইতিহাস আরম্ভ করিতেছি, তাহার কিছু পূর্বে আমার স্বামী বাড়ী আসিলেন। রব উঠিল যে, তিনি কমিসেরিয়েটের কর্ম করিয়া অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়া আসিয়াছেন। আমার শ্বশুর আমার পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনার আশীর্বাদে (আমার স্বামীর নাম উপেন্দ্র) বধূমাতাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম। পাল্কীবেহারা পাঠাইলাম, বধূমাতাকে এ বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবেন। নচেৎ পুত্রের আবার সম্বন্ধ করিব।"

পিতা দেখিলেন, বড় মানুষ বটে। পাল্কীখানার ভিতরে কিংখাপ মোড়া, উপরে রূপার বিট, বাঁটে রূপার হাঙ্গরের মুখ। দাসী যে আসিয়াছিল, সে গরদ পরিয়া আসিয়াছে, গলায় বড় মোটা সোনার

দানা। চারি জন কালো দাড়িওয়ালা ভোজপুরে পাল্কীর সঙ্গে আসিয়াছিল।

আমার পিতা হরমোহন দত্ত বুনিয়াদি বড়মানুষ,হাসিয়া বলিলেন, "মা ইন্দিরে! আর তোমাকে রাখিতে পারিলাম না। এখন যাও, আবার শীঘ্র লইয়া আসিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্বশুরবাড়ী চলিলাম

আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। আমার শ্বশুরবাড়ী মনোহরপুর। আমার পিত্রালয় মহেশপুর। উভয় গ্রামের মধ্যে দশ ক্রোশ পথ, সুতরাং প্রাতে আহার করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, পৌঁছিতে পাঁচ-সাত দণ্ড রাত্রি হইবে জানিতাম।

পথে কালাদীঘি নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। তাহার জল প্রায় আধক্রোশ, পাড় পর্বতের ন্যায় উচ্চ। তাহার ভিতর দিয়া পথ। চারি পার্শ্বে বটগাছ। তথায় মনুষ্যের সমাগম বিরল। ঘাটের উপর একখানি দোকান আছে মাত্র।

দস্যুতার ভয়ে এখানে দলবদ্ধ না হইয়া লোক আসিত না। লোকে 'ডাকাতে কালাদীঘি' বলিত। দোকানদারকে লোকে দস্যুদিগের সহায় বলিত। আমার সে ভয় ছিল না। আমার সঙ্গে অনেক লোক—ষোল জন বাহক, চারি জন দ্বারবান্ এবং অন্যান্য লোক ছিল। যখন আমরা এইখানে পৌঁছিলাম, তখন আড়াই প্রহর। বাহকেরা বলিল, "আমরা কিছু জলটল না খাইলে আর যাইতে পারি না।" দ্বারবানেরা বারণ করিল, বলিল, "এ স্থান ভাল নয়।" বাহকেরা উত্তর করিল, "আমরা এত লোক আছি আমাদিগের ভয় কি?" আমার সঙ্গের লোকজন ততক্ষণ কেহই কিছু খায় নাই, শেষে সকলেই বাহকদিগের মতে মত করিল।

দীঘির ঘাটে বটতলায় আমার পাল্কী নামাইল। বেহারা পাল্কী নামাইয়া হাঁটু উঁচু করিয়া ময়লা গাম্‌ছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল।

আমি অল্প দ্বার খুলিয়া দীঘি দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বাহকেরা সকলে দোকানের সম্মুখে এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া জলপান খাইতেছে। সে স্থান আমার নিকট হইতে প্রায় দেড় বিঘা। সম্মুখে অতি নিবিড় মেঘের ন্যায় বিশাল দীর্ঘিকা বিস্তৃত রহিয়াছে, চারিপার্শ্বে উচ্চ শ্যামল তৃণাবরণ-শোভিত "পাড়"—পাড় এবং জলের বিস্তৃত ভূমিতে দীর্ঘ বটবৃক্ষশ্রেণী। পাড়ে অনেক গোবৎস চরিতেছে। জলের উপর জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে। মৃদু মৃদু তরঙ্গ-হিল্লোলে জলজ পুষ্প, পত্র এবং শৈবাল দুলিতেছে। দেখিতে পাইলাম যে, আমার দ্বারবানেরা জলে নামিয়া স্নান করিতেছে।

আকাশপানে চাহিয়া দেখিলাম, কি সুন্দর নীলিমা, কি সুন্দর শ্বেতমেঘের স্তর, নভস্তলে উড্ডীন ক্ষুদ্র পক্ষীসকলের কৃষ্ণবিন্দুনিচয় তুল্য শোভা।

আবার সরোবর প্রতি চাহিয়া দেখিলাম আমার সঙ্গের লোক সকলেই এককালে স্নানে নামিয়াছে। আমার মনে একটু ভয় হইল —কেহ নিকটে নাই—স্থান মন্দ, ভাল করে নাই। কি করি, আমি কুলবধূ, মুখ ফুটিয়া কাহাকে ডাকিতে পারিলাম না।

এমত সময়ে পাল্কীর অপর পার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল। যেন, বটবৃক্ষের শাখা হইতে কিছু গুরু পদার্থ পড়িল। আমি সে দিকের কবাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম, কে এক জন কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মনুষ্য। ভয়ে দ্বার বন্ধ করিলাম। আর এক জন মানুষ গাছের

উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে আর এক জন, আবার এক জন। এইরূপ চারিজন প্রায় এককালেই গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পাল্কী কাঁধে করিয়া উঠাইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল।

দেখিতে পাইয়া আমার দ্বারবানেরা "কোন্ হ্যায় রে?" রব তুলিয়া জল হইতে দৌড়িল।

তখন বুঝিলাম যে, আমি দস্যুহস্তে পড়িয়াছি। পাল্কীর উভয় দ্বার মুক্ত করিলাম। আমি লাফাইয়া পড়িয়া পলাইব মনে করিলাম, কিন্তু দেখিলাম যে, আমার সঙ্গের সকল লোক অত্যন্ত কোলাহল করিয়া পাল্কীর পিছনে দৌড়াইল। অতএব ভরসা হইল। আমি বলিয়াছি, জলের ধারে বটবৃক্ষের শ্রেণী। সেই সকল বৃক্ষের নীচে দিয়া দস্যুরা পাল্কী লইয়া যাইতেছিল। সেই সকল বৃক্ষ হইতে মনুষ্য লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের কাহারও হাতে বাঁশের লাঠি, কাহারও হাতে গাছের ডাল।

লোকসংখ্যা অধিক দেখিয়া আমার সঙ্গের লোকেরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। আমি মনে করিলাম, লাফাইয়া পড়ি। কিন্তু এক জন দস্যু আমাকে লাঠি দেখাইয়া বলিল যে, "নামিবি ত মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

এক জন দ্বারবান্ অগ্রসর হইয়া আসিয়া পাল্কী ধরিল। তখন এক জন দস্যু তাহাকে লাঠির আঘাত করিল। সে পড়িল। আর উঠিল না।

ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রক্ষিগণ নিরস্ত হইল। বাহকেরা আমাকে নির্বিঘ্নে লইয়া গেল। রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত এইরূপ বহন করিয়া পরিশেষে পাল্কী নামাইল। যেখানে নামাইল, সে স্থানে নিবিড়

বন—অন্ধকার। দস্যুরা একটা মশাল জ্বালিল। আমাকে কহিল, "তোমার যাহা কিছু আছে, দাও—নহিলে প্রাণে মারিব।" আমার অলঙ্কার বস্ত্রাদি সকল দিলাম। কেবল হাতের বালা খুলিয়া দিই নাই—তাহারা কাড়িয়া লইল। তাহারা একখানি মলিন জীর্ণ বস্ত্র দিল, তাহা পরিয়া পরিধানের বহুমূল্য বস্ত্র ছাড়িয়া দিলাম। দস্যুরা আমার সর্বস্ব লইয়া পাল্কী ভাঙ্গিয়া রূপা খুলিয়া লইল। পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া ভগ্ন শিবিকা দাহ করিয়া দস্যুতার চিহ্নমাত্র লোপ করিল।

তাহারাও চলিয়া যায়, দেখিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। কহিলাম, "তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।"

এক প্রাচীন দস্যু বলিল, "বাছা, মেয়ে আমরা কোথায় লইয়া যাইব? তোমার মত মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখিলেই আমাদের ধরিবে।"

সেই প্রাচীন দস্যু ঐ দলের সর্দার। তাহারা চলিয়া গেল।

———

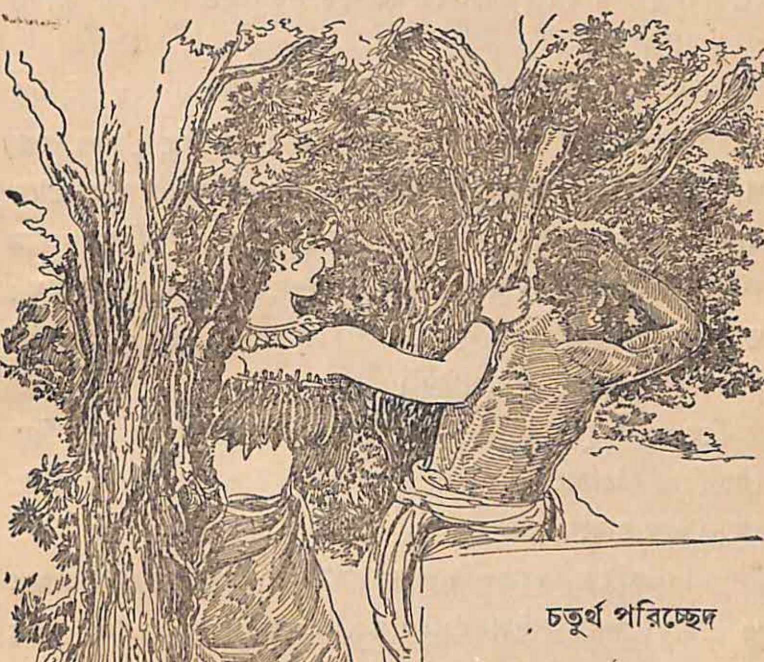
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সুখ

এত বিপদ, এত দুঃখ কাহারও কখন ঘটিয়াছে? কোথায় যাইব? বাপ-মাকেও বুঝি দেখিতে পাইব না। কাঁদিলেও ত কান্না ফুরায় না।

দূরে একটা বিকট গর্জন হইল। মনে করিলাম বাঘ। আহ্লাদ হইল। বাঘে খাইলে সকল জ্বালা জুড়ায়। বাঘের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। পাতার যত বার খস্ খস্ শব্দ হয়, তত বার মনে করি, ঐ বাঘ আসিতেছে। কিন্তু অনেক রাত্রি হইল, তবুও বাঘ আসিল না। হতাশ হইলাম। তখন মনে হইল—যেখানে বড় ঝোপ-জঙ্গল, সেইখানে সাপ থাকিতে পারে। সাপের ঘাড়ে পা দিবার আশায় সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলাম, তাহার ভিতরে কত বেড়াইলাম! বনমধ্যে কত সর্ সর্ ঝটপট্ শব্দ শুনিলাম, কিন্তু সাপের ঘাড়ে ত পা পড়িল না। আমার পায়ে অনেক কাঁটা ফুটিল, অনেক বিছুটি লাগিল, কিন্তু কৈ, সাপে ত কামড়াইল না? হতাশ হইয়া একটা পরিষ্কার স্থান দেখিয়া বসিলাম। সহসা সম্মুখে এক ভালুক উপস্থিত হইল—মনে করিলাম, ভালুকের হাতেই মরিব। কিন্তু হায়! ভালুকটা আমায় কিছু বলিল না। সে গিয়া এক বৃক্ষে উঠিল। বৃক্ষের উপর হইতে ঝন্‌ঝন্ করিয়া মক্ষিকার শব্দ হইল। বুঝিলাম, এই বৃক্ষে মৌচাক আছে, ভালুক জানিত, মধু লুঠিবার লোভে আমায় ত্যাগ করিল।

শেষ রাত্রিতে একটু নিদ্রা আসিল—বসিয়া বসিয়া গাছে হেলান দিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এখন যাই কোথায় ?

যখন আমার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন কাক-কোকিল ডাকিতেছে—বাঁশের পাতার ভিতর দিয়া টুকরা রৌদ্র আসিয়া পৃথিবীকে মণি-মুক্তায় সাজাইয়াছে। আলোতে প্রথমেই দেখিলাম, আমার হাতে কিছুই নাই, দস্যুরা সকল কাড়িয়া লইয়া বিধবা সাজাইয়াছে। বাঁ-হাতে এক টুকরা লৌহ আছে—কিন্তু দাহিন

হাতে কিছুই নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে একটু লতা ছিঁড়িয়া দাহিন হাতে বাঁধিলাম।

তারপর চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলাম যে, নিকটে অনেকগুলি গাছের ডাল কাটা, কোন গাছ সমূলে ছিন্ন, কেবল শাখা পড়িয়া আছে। এখানে কাঠুরিয়া আসিয়া থাকে। তবে গ্রামে যাইবার পথ আছে। আবার বাঁচিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সন্ধান করিতে করিতে একটা অতি অস্পষ্ট পথের রেখা দেখিতে পাইলাম। তাই ধরিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে পথের রেখা আরও স্পষ্ট হইল, ভরসা হইল, গ্রাম পাইব।

যে ছেঁড়া-মুড়া কাপড়টুকু ডাকাইতেরা আমাকে পরাইয়া দিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কোনমতে কোমর হইতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে, আমার বুকে কাপড় নাই।

গাছ হইতে কতকগুলি পাতা ছিঁড়িয়া গাঁথিয়া তাহা কোমরে ও গলায় ছোটা দিয়া বাঁধিলাম। লজ্জানিবারণ হইল, কিন্তু পাগলের মত দেখাইতে লাগিল। তখন সেই পথ ধরিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে গোরুর ডাক শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম, গ্রাম নিকট।

কিন্তু আর চলিতে পারি না। কখনও চলা অভ্যাস নাই। অবসন্ন হইয়া পথিপার্শ্বস্থ এক বৃক্ষতলে শুইয়া পড়িলাম। শুইবামাত্র নিদ্রাভিভূত হইলাম।

কাহারও স্পর্শে ঘুম ভাঙ্গিল। দেখিলাম, একজন যুবা পুরুষ; কুলীমজুরের মত, আমার হাত ধরিয়া টানিতেছে। সৌভাগ্যক্রমে একখানা কাঠ সেখানে পড়িয়া ছিল; তাহা তুলিয়া লইয়া সেই

পাপিষ্ঠের মাথায় মারিলাম। সে ব্যক্তি মাথায় হাত দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইল।

কাঠখানা আর ফেলিলাম না, তাহার উপর ভর দিয়া চলিলাম। অনেক পথ হাঁটিয়া, এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পাইলাম। সে একটা গাই তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মহেশপুর কোথায় ? মনোহরপুরই বা কোথায় ? প্রাচীনা বলিল, "মা, তুমি কে ? অমন সুন্দরী মেয়ে কি পথে ঘাটে একা বেরুতে আছে ? তুমি আমার ঘরে আইস।" তাহার ঘরে গেলাম। সে আমাকে গাইটি দুইয়া একটু দুধ খাইতে দিল। সে মহেশপুর চিনিত। তাহাকে আমি বলিলাম যে, "তোমাকে টাকা দেওয়াইব—তুমি আমাকে সেখানে রাখিয়া আইস।" তাহাতে সে কহিল যে, "আমার ঘর-সংসার ফেলিয়া যাইব কি প্রকারে ?" তখন সে যে পথ বলিয়া দিল, আমি সেই পথে গেলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত পথ হাঁটিলাম, তাহাতে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইল। একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ গা, মহেশপুর এখান হইতে কত দূর ?" সে কহিল, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?" যে গ্রামে প্রাচীনা আমাকে পথ বলিয়া দিয়াছিল, আমি সেই গ্রামের নাম করিলাম। পথিক কহিল যে, "তুমি বরাবর উল্টা আসিয়াছ। মহেশপুর এখান হইতে এক-দিনের পথ।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোথায় যাইবে ?" সে বলিল, "আমি নিকটে গৌরীগ্রামে যাইব।" আমি অগত্যা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কাহার বাড়ী যাইবে ?"

আমি কহিলাম, "আমি এখানে কাহাকেও চিনি না। একটা গাছতলায় শয়ন করিয়া থাকিব।"

পথিক কহিল, "তুমি কি জাতি ?"

আমি কহিলাম, "আমি কায়স্থ।"

সে কহিল, "আমি ব্রাহ্মণ। তুমি আমার সঙ্গে আইস।"

ব্রাহ্মণ প্রাচীন, সে রাত্রে ব্রাহ্মণের গৃহে একটু বিশ্রাম লাভ করিলাম। সেই দয়ালু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাজক, পৌরোহিত্য করেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার কাপড়ের এমন দশা কেন ? তোমার কাপড় কি কেহ কাড়িয়া লইয়াছে ?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ।" তিনি যজমানদিগের নিকট অনেক কাপড় পাইতেন— তুইখানা খাটো বহরের সাড়ী আমাকে পরিতে দিলেন। শাঁখার কড় তাঁহার ঘরে ছিল, তাহাও চাহিয়া লইয়া পারিলাম।

ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী তুটি ভাত দিলেন—খাইলাম। একটা মাতুর পাতিয়া শুইলাম। কিন্তু ঘুম হইল না।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম যে, আমার অত্যন্ত গা-বেদনা হইয়াছে। পা ফুলিয়া উঠিয়াছে ; বসিবার শক্তি নাই।

যত দিন না গায়ের বেদনা আরাম হইল, তত দিন আমাকে ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিতে হইল। ব্রাহ্মণ ও তাঁহার গৃহিণী আমাকে যত্ন করিয়া রাখিলেন, কিন্তু মহেশপুর যাইবার কোন উপায় দেখিলাম না। কোন স্ত্রীলোকেই পথ চিনিত না, অথবা যাইতে স্বীকার

করিল না। পুরুষে অনেকেই স্বীকৃত হইল—কিন্তু তাহাদিগের সহিত একাকিনী যাইতে ব্রাহ্মণও নিষেধ করিলেন।

একদিন শুনিলাম যে, ঐ গ্রামের কৃষ্ণদাস বসু নামক একজন ভদ্রলোক সপরিবারে কলিকাতায় যাইবেন। সেখানে আমার জ্ঞাতি খুল্লতাত বাস করিতেন। আমি ভাবিলাম যে, কলিকাতায় গেলে অবশ্য খুল্লতাতের সন্ধান পাইব। তিনি অবশ্য আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। না হয়, আমার পিতাকে সংবাদ দিবেন।

আমি এই কথা ব্রাহ্মণকে জানাইলাম।

ব্রাহ্মণ আমাকে কৃষ্ণদাসবাবুর কাছে লইয়া গেলেন। কৃষ্ণদাসবাবু সম্মত হইলেন। পরদিন তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। প্রথম দিন চারি পাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিতে হইল। পরদিন নৌকায় উঠিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাজিয়ে যাব মল

আমি গঙ্গা কখনও দেখি নাই। এখন গঙ্গা দেখিয়া আহ্লাদে প্রাণ ভরিয়া গেল—এত দুঃখ সব ভুলিলাম। গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউ—ছোট ঢেউয়ের উপর রৌদ্রের ঝিকিমিকি—যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর জ্বলিতে জ্বলিতে ছুটিয়াছে—তীরে কুঞ্জের মত সাজান বৃক্ষের অনন্ত শ্রেণী ; জলে কত রকমের কত নৌকা ; জলের উপর দাঁড়ের শব্দ, দাঁড়িমাঝির শব্দ, জলের উপর কোলাহল, তীরে ঘাটে ঘাটে কোলাহল। কত রকমের কত লোক ; কত রকমে স্নান করিতেছে। আবার কোথায় সাদা মেঘের মত অসীম সৈকতভূমি—তাতে কত প্রকারের পক্ষী কত শব্দ করিতেছে। কয় দিন দেখিতে দেখিতে আসিলাম।

দূর হইতে কলিকাতা দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলাম! অট্টালিকা, বাড়ীর গায়ে বাড়ী, বাড়ীর পিঠে বাড়ী, তার পিঠে বাড়ী, অট্টালিকার সমুদ্র—তাহার অন্ত নাই, সংখ্যা নাই, সীমা নাই। জাহাজের মাস্তুলের অরণ্য দেখিয়া জ্ঞানবুদ্ধি বিপর্যস্ত হইয়া গেল। নৌকার অসংখ্য অনন্ত শ্রেণী দেখিয়া মনে হইল, এত নৌকা মানুষে গড়িল কি প্রকারে? নিকটে আসিয়া দেখিলাম, তীরবর্তী রাজপথে গাড়ী, পাল্কী পিঁপড়ের সারির মত চলিয়াছে—যাহারা হাঁটিয়া যাইতেছে, তাহাদের সংখ্যার ত কথাই নাই। তখন মনে হইল, ইহার ভিতর খুড়াকে খুঁজিয়া বাহির করি কি প্রকারে? *

---

* কলিকাতায় এক্ষণে নৌকার সংখ্যা পূর্বেকার শতাংশও নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুবো

কৃষ্ণদাস বাবু কলিকাতায় কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার খুড়ার বাড়ী কোথায়?"

তাহা আমি জানিতাম না।

আমি জানিতাম, যেমন মহেশপুর একখানি গণ্ডগ্রাম, কলিকাতা তেমনই একখানি গণ্ডগ্রাম মাত্র, এক জন ভদ্রলোকের নাম করিলেই লোকে বলিয়া দিবে। এখন দেখিলাম যে, কলিকাতা অনন্ত অট্টালিকার সমুদ্রবিশেষ। আমার জ্ঞাতি-খুড়াকে সন্ধান করিবার কোন উপায় দেখিলাম না। কৃষ্ণদাস বাবু আমার হইয়া সন্ধান করিলেন, কিন্তু কলিকাতায় এক জন সামান্য গ্রাম্য লোকের ওরূপ সন্ধান করিলে কি হইবে?

কালীর পূজা দেওয়া হইল, এক্ষণে সপরিবারে কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তাঁহার পত্নী কহিলেন, "তুমি আমার কথা শুন। এখন কাহারও বাড়ীতে দাসীপনা কর। আজ সুবি আসিবার কথা আছে, তাকে বলিয়া দিব, তাদের বাড়ীতে তোমায় চাকরাণী রাখিবে।"

আমি শুনিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। শেষ কি কপালে দাসীপনা ছিল?

আমি একটা ঘরের ভেতর গিয়া কোণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার অল্পপূর্বে কৃষ্ণদাস বাবুর গিন্নী আমাকে ডাকিলেন।

বলিলেন, "এই সুবো এয়েছে। তুমি যদি ওদের বাড়ী ঝি থাক, তবে বলিয়া দিই।"

"সুবো" একটি স্ত্রীলোক। মানুষটি আমারই বয়সী হইবে, রঙ্গ আমা অপেক্ষা যে ফরসা, তাও নয়। বেশ-ভূষা এমন কিছু নয়। কানে গোটাকতক মাকৃড়ি, হাতে বালা, গলায় চিক, একখানা কালা-পেড়ে কাপড় পরা। সঙ্গে একটি তিন বছরের ছেলে—সেটিও একটি আধফুটন্ত ফুল! উঠিতেছে, বসিতেছে, খেলিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, নাচিতেছে, দৌড়াইতেছে, হাসিতেছে, বকিতেছে, মারিতেছে, সকলকে আদর করিতেছে।

আমি সুবোকে ও তার ছেলেকে দেখিতেছি, কৃষ্ণদাস বাবুর গৃহিণী চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কথার উত্তর দাও না যে,—ভাব কি ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"উনি কে ?"

গৃহিণী ঠাকুরাণী ধমকাইয়া বলিলেন, "তাও কি বলিয়া দিতে হইবে ? ও সুবো, আর কে ?" তখন সুবো একটু হাসিয়া বলিল, "তা মাসীমা, একটু বলিয়া দিতে হয় বৈকি, উনি নূতন লোক, আমায় ত চেনেন না। আমার নাম সুভাষিণী—ইনি আমার মাসীমা, আমাকে ছেলেবেলা থেকে ওঁরা সুবো বলেন।" তার পর গৃহিণী বলিলেন, "কলকাতার রামরাম দত্তের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। ও শ্বশুরবাড়ীই থাকে—আমি কালীঘাটে এসেছি শুনে আমাকে একবার দেখা দিতে এসেছে। ওরা বড়মানুষ, বড়মানুষের বাড়ী তুমি কাজকর্ম করিতে পারিবে ত ?"

আমার চোখে জলও আসিল; মুখে হাসিও আসিল। তাহা সুভাষিণী দেখিল। বলিল, "আমি একটু আড়ালে সে সকল কথা

ওঁকে বলি গে। যদি উনি রাজি হন, তবে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।” সুভাষিণী আমার হাত ধরিয়া একটা ঘরের ভিতর লইয়া গেল। সেখানে কেহ ছিল না। একখানা তক্তপোষ পাতা ছিল, সুভাষিণী তাহাতে বসিল, আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইল। বলিল, “তোমার নাম কি ভাই?”

“ভাই!” যদি দাসীপনা করিতে পারি, তবে ইহার কাছে পারি, মনে মনে ইহা ভাবিয়া ইহার উত্তর করিলাম, “আমার নাম কুমুদিনী!”

সুভাষিণী বলিল, “জাতি কায়স্থ বটে?”

হাসিয়া বলিলাম, “আমরা কায়স্থ।”

সুভাষিণী বলিল, “কার মেয়ে, কোথা বাড়ী, তাহা এখন জিজ্ঞাসা করিব না। এখন যাহা বলিব, তাহা শুন। তুমি বড় মানুষের মেয়ে, তা আমি জানিতে পারিয়াছি—তোমার হাতে, গলায় গহনার কালি আজও রহিয়াছে। তোমাকে দাসীপনা করিতে বলিব না—তুমি কিছু রাঁধিতে জান না কি?”

আমি বলিলাম, “জানি। রান্নায় আমি পিত্রালয়ে যশস্বিনী ছিলাম।”

সুভাষিণী বলিল, “আমাদের বাড়ীতে আমরা সকলেই রাঁধি। তোমাকে রাঁধুনীর মত রাঁধিতে হইবে না। আমরা সকলে রাঁধিব, তার সঙ্গে তুমি দুই-একদিন রাঁধিবে। কেমন রাজি?”

আমি বলিলাম, “আপনার কাছে আমি দাসীপনা করিতেও রাজি।”

“আপনি বল কেন ভাই? বল ত মাকে বলিও। সেই মাকে

লইয়া একটু গোল আছে। তিনিও একটু খিট্‌খিটে—তাঁকে বশ করিয়া লইতে হইবে, তা তুমি পারিবে।—আমি মানুষ চিনি। কেমন, রাজি ?"

আমি বলিলাম, "রাজি না হইয়া কি করি ? আমার আর উপায় নাই।" আমার চক্ষুতে আবার জল আসিল।

সে বলিল, "উপায় নাই কেন ?"

সুভাষিণী ছুটিয়া মাসীর কাছে গেল—বলিল, "হাঁ গা, ইনি তোমাদের কে গা ?"

তার মাসী কি বলিলেন, তা শুনিতে পাইলাম না। সুভাষিণী ফিরিয়া আসিল।

বলিল, "চল, গাড়ী তৈয়ার। না যাও, আমি ধরিয়া লইয়া যাইব।"

সুভাষিণী আমাকে টানিয়া লইয়া গিয়া গাড়ীতে তুলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কালির বোতল

মা—সুভাষিণীর শাশুড়ী। তাঁহাকে বশ করিতে হইবে—সুতরাং গিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইলাম, তিনি তখন ছাদের উপর অন্ধকারে একটা পাটি পাতিয়া, তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া আছেন, একটা ঝি পা টিপিয়া দিতেছে। আমার বোধ হইল, একটা লম্বা কালির বোতল গলায় গলায় কালি-ভরা—পাটির উপর কাত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। পাকা চুলগুলি টিনের ঢাকনির * মত শোভা পাইতেছে। অন্ধকারটা বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া গৃহিণী ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে ?"

বধূ বলিল, "তুমি একটি রাঁধুনী খুঁজিতেছিলে, তাই একে নিয়ে এসেছি।"

গৃহিণী। কোথায় পেলে ?

বধূ। মাসীমা দিয়াছেন।

গৃ। বামন ? না কায়েত ?

ব। কায়েত।

গৃ। আঃ! তোমার মাসীমার পোড়াকপাল। কায়েতের মেয়ে নিয়ে কি হবে? একদিন বামনকে ভাত দিতে হ'লে কি দিব ?

ব। রোজ ত আর বামনকে ভাত দিতে হবে না। যে কয়দিন

---

* capsul,

চলে চলুক—তার পর বামনী পেলে রাখা যাবে—তা বামনের ঠ্যাকার বড়—আমরা তাঁদের রান্নাঘরে গেলে হাঁড়িকুঁড়ি ফেলিয়া দেন, আবার পাতের প্রসাদ দিতে আসেন। কেন, আমরা কি মুচি?

গৃহিণী বলিলেন, "তা সত্য বটে মা—ছোট লোকের এত অহঙ্কার সওয়া যায় না। তা এখন দিনকতক কায়েতের মেয়েই রেখে দেখি। মাইনে কত বলেছে?"

ব। তা আমার সঙ্গে কোন কথা হয় নাই।

গৃ। লোক রাখতে নিয়ে এসেছ, তার মাইনের কথা কও নাই?

আমাকে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নেবে তুমি?"

আমি বলিলাম, "যখন আপনাদের আশ্রয় এয়েছি তখন যা দিবেন তাই নিব।"

গৃ। বামনের মেয়েকে কিছু বেশী দিতে হয় কিন্তু তুমি কায়েতের মেয়ে—তোমায় তিন টাকা মাসে আর খোরাক-পোষাক দিব।

আমার একটু আশ্রয় পাইলেই যথেষ্ট—বলিলাম "তাই দিবেন।"

মনে করিলাম, গোল মিটিল—কিন্তু তাহা নহে। তিনি বলিলেন, "তোমার বয়স কি গা? অন্ধকারে বয়স ঠাওর পাইতেছি না—কিন্তু গলাটা ছেলেমানুষের মত বোধ হইতেছে।"

আমি বলিলাম, "বয়স এই উনিশ কুড়ি।"

গৃহিণী। তবে বাছা, অন্যত্র কাজের চেষ্টা দেখ, ফিরে যাও। আমি সমত্ত লোক রাখি না।

সুভাষিণী বলিল, "কেন মা, সমত্ত লোক কি কাজকর্ম করে না?"

গৃ। দূর বেটী পাগলের মেয়ে। সমত্ত লোক কি লোক ভাল হয়।

সু। সে কি মা! দেশশুদ্ধ সমস্ত লোক কি মন্দ?

গৃ। তা নাই হলো—তবে ছোট লোক—যারা খেটে খায়, তারা কি ভাল?

এবার কান্না রাখিতে পারিলাম না; কাঁদিয়া উঠিয়া গেলাম। কালির বোতলটা পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিল, "ছুঁড়ী চল্‌লো না কি?"

সুভাষিণী বলিল, "বোধ হয়।"

গৃ। তা যাক্ গে।

সু। কিন্তু গৃহস্থবাড়ী থেকে না খেয়ে যাবে? উহাকে কিছু খাওয়াইয়া বিদায় করিতেছি।

এই বলিয়া সুভাষিণী আমার পিছু পিছু উঠিয়া আসিল। আমাকে ধরিয়া আপনার শয়নগৃহে লইয়া গেল। আমি বলিলাম, "আর আমায় ধরিয়া রাখিতেছ কেন?"

সুভাষিণী বলিল, "আমার অনুরোধে আজিকার রাত্রিটা থাক।"

কোথায় যাইব? কাজেই সে রাত্রিটা থাকিতে সম্মত হইলাম। সুভাষিণী জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে যদি না থাক, তবে যাবে কোথায়?"

আমি বলিলাম, "গঙ্গায়।"

সুভাষিণী বলিল, "গঙ্গায় যাইতে হইবে না। আমি কি করি, তা একটুখানি বসিয়া দেখ। গোলযোগ উপস্থিত করিও না।"

সুভাষিণী হারাণী বলিয়া ঝিকে ডাকিল। হারাণী সুভাষিণীর খাস ঝি। হারাণী আসিল। মোটা-সোটা, কাল কুচকুচে, চল্লিশ পার, হাসি মুখে ধরে না, সকল-তাতেই হাসি। সুভাষিণী বলিল, "একবার তাঁকে ডেকে পাঠাও।"

হারাণী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

আমি বলিলাম, "আমায় উঠিয়া যাইতে হইবে কি ?"

সুভাষিণী বলিল, "না। এইখানে বসিয়া থাক।"

সুভাষিণীর স্বামী আসিলেন। আসিয়াই আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "ইনি কে ?"

সুভাষিণী বলিল, "ওঁর জন্যই তোমাকে ডেকেছি। আমাদের রাঁধুনী বাড়ী যাইবে, তাই ওঁকে তার জায়গায় রাখিবার জন্য আমি মাসীর কাছ হইতে এনেছি। কিন্তু মা ওঁকে রাখতে চান না।"

সুভার স্বামী একটু হাসিলেন। বলিলেন, "তা আমায় কি করিতে হইবে ?"

সু। ওঁকে রাখিয়ে দিতে হবে।

"যে আজ্ঞা।"

সুভা। কখন্ পারিবে ?

স্বামী। খাওয়ার সময়।

রাত্রি নয়টার সময়, সুভাষিণীর স্বামী (তাঁর নাম রমণবাবু) আহার করিতে আসিলেন। তাঁর মা কাছে গিয়া বসিল। সুভাষিণী আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। বলিল, "কি হয়, দেখি -গে চল।"

আমরা আড়াল হইতে দেখিলাম, নানাবিধ ব্যঞ্জন রান্না হইয়াছে, কিন্তু রমণবাবু একবার একটু করিয়া মুখে দিলেন, আর সরাইয়া রাখিলেন। কিছুই খাইলেন না। তাঁর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছুই ত খেলি না বাবা ?"

পুত্র বলিল, "ও রান্না ভূত-প্রেতে খেতে পারে না ; বামুন

ঠাকুরাণীর রান্না খেয়ে খেয়ে অরুচি জন্মে গেছে। মনে করেছি, কাল থেকে পিসিমার বাড়ী গিয়ে খেয়ে আসব!"

গৃহিণী বলিলেন, "তা কর্‌তে হবে না যাদু! আমি রাঁধুনী আনাইতেছি।"

বাবু হাত ধুইয়া উঠিয়া গেলেন। সুভাষিণী বলিল, "আমাদের জন্য ভাই ওঁর খাওয়া হইল না। তা না হোক—কাজটা হইলে হয়।"

এমন সময় হারাণী আসিয়া সুভাষিণীকে বলিল, "তোমার শাশুড়ী ডাকিতেছেন।" সুভাষিণী শাশুড়ীর কাছে গেল, আমি আড়াল হইতে শুনিতে লাগিলাম।

সুভাষিণীর শাশুড়ী বলিতে লাগিল, "সে কায়েত ছুঁড়ীটে চ'লে গেছে কি?"

সুভা। না, তার এখনও খাওয়া হয় নাই বলিয়া যাইতে দিই নাই।

গৃহিণী বলিলেন, "সে রাঁধে কেমন?"

সুভা। তা জানি না।

গৃ। আজ না হয় সে নাই গেল। কা'ল তাকে দিয়া দুই একখানা রাঁধিয়ে দেখিতে হইবে।

সুভা। তবে তাকে রাখি গে।

এই বলিয়া সুভাষিণী আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, তুমি রাঁধিতে জান ত? যদি অভ্যাস না থাকে, তবে বল, আমি কাছে বসিয়া শিখিয়ে দিব।"

আমি হাসিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিবি পাণ্ডব

পরদিন রাঁধিলাম।

রান্না হইলে, বালক-বালিকারা প্রথমে খাইল। সুভাষিণীর পাঁচ বৎসরের একটি মেয়ে ছিল। সুভাষিণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন রান্না হয়েছে, হেমা?"

সে বলিল, "বেশ! বেশ গো বেশ!

রাঁধ বেশ, বাঁধ কেশ,
বকুল-ফুলের মালা,
রাঙ্গা সাড়ী, হাতে হাঁড়ি,
রাঁধছে গোয়ালার বালা।"

মা ধমকাইল—"নে শ্লোক রাখ্।" তখন মেয়ে চুপ করিল।

তার পর রমণবাবু খাইতে বসিলেন। আড়াল হইতে দেখিলাম, তিনি সমস্ত ব্যঞ্জনগুলি কুড়াইয়া খাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কে রেঁধেছে মা?"

গৃহিণী বলিলেন, "একটি নূতন লোক আসিয়াছে।"

রমণবাবু বলিলেন, "রাঁধে ভাল।"

তার পর কর্তা খাইতে বসিলেন। বুড়া বামুন-ঠাকুরাণী কর্তার ভাত লইয়া গেলেন।

ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কর্তা রান্না খেয়ে কি বল্লেন?"

বামনী চটিয়া লাল, চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল. "ওগো, বেশ রেঁধেছ গো, বেশ রেঁধেছ, আমরাও রাঁধিতে জানি।

বুঝিলাম, কর্তা খাইয়া ভাল বলিয়াছেন।

রাগের মাথায় একটা হাঁড়ি চড়াইতে গিয়া পাচিকা দেবী হাঁড়িটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আমি বলিলাম, "দেখিলে দিদি।"

ব্রাহ্মণী বেড়ি নিয়া আমাকে মারিতে আসিলেন।

এই সময়ে সুভাষিণী সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বামনী রাগে আমাকে তাড়াইয়া আসিয়া বলিল, "হারামজাদী! যা মুখে আসে, তাই বল্‌বি?

তখন সুভাষিণী তাহাকে বলিল, "আমি লোক এনেছি, তুমি হারামজাদী বল্‌বার কে? তুমি বেরোও আমার বাড়ী থেকে।"

তখন পাচিকা শশব্যস্তে বেড়ি ফেলিয়া দিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "ও মা, সে কি কথা গো! আমি কখন হারামজাদী বল্লেম? এমন কথা আমি কখন মুখেও আনি নে। তোমরা আশ্চর্য করিলে মা।"

সুভাষিণী হাসিয়া উঠিল। বামন ঠাকুরাণী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, "আমি যদি হারামজাদী ব'লে থাকি, তবে আমি যেন গোল্লায় যাই—"

আমি বলিলাম, "বালাই! ষাট!"

"আমি যেন যমের বাড়ী যাই—"

আমি। সে কি দিদি; এত সকাল সকাল! ছি দিদি! আর দু'দিন থাক না।

"আমার যেন নরকেও ঠাঁই হয় না—!"

এবার আমি বলিলাম, "ওটি বলিও না, দিদি। নরকের লোক যদি তোমার রান্না না খেলে, তবে নরক কি ?"

বুড়ী কাঁদিয়া সুভাষিণীর কাছে নালিশ করিল, "আমাকে যা মুখে আসিবে, তাই বলিবে, আর তুমি কিছু বলিবে না ? আমি চল্লেম গিন্নীর কাছে।"

সুভা। বাছা, তা হ'লে আমাকেও বলিতে হইবে, তুমি একে হারামজাদী বলেছ।

বুড়ী তখন গালে চড়াইতে আরম্ভ করিল, "আমি কখন্ হারামজাদী বল্লেম ? (এক ঘা)—আমি কখন হারামজাদী বল্লেম ? (দুই ঘা)—আমি কখন হারামজাদী বল্লেম ? (তিন ঘা)"—ইতি সমাপ্ত।

তখন আমরা বুড়ীকে কিছু মিষ্ট কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে আমি বলিলাম, "হাঁ গা বৌঠাকুরাণি, হারামজাদী বল্‌তে তুমি কখন্ শুনিলে ? কৈ, আমি ত শুনি নাই।"

বুড়ী তখন বলিল, "এই শুনিলে বৌদিদি। আমার মুখে কি অমন সব কথা বেরোয় ?"

সুভাষিণী বলিল, "তা হবে—বাহিরে কে কাকে বলিতেছিল, সেই কথাটা আমার কানে গিয়া থাকিবে। বামুন ঠাকুরাণী কি তেমন লোক ? ওঁর রান্না কা'ল খেয়েছিলে ত ? এ কলিকাতার ভিতর অমন কেউ রাঁধিতে পারে না।"

বামনী আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "শুন্‌লে গা।"

আমি বলিলাম, "আমি অমন রান্না খাই নাই।"

বুড়ী এক গাল হাসিয়া বলিল, "তা তোমরা বল্‌বে বৈ কি মা।

তোমরা হ'লে মানুষের মেয়ে, তোমরা ত রান্না চেন! আহা! অমন মেয়েকে কি আমি গালি দিতে পারি—এ কোন বড়ঘরের মেয়ে। তা তুমি দিদি, ভেবো না, আমি তোমাকে রান্না শিখিয়ে দিয়ে তবে যাব।"

আমি অনেক দিন ধরিয়া কেবল কাঁদিয়াছিলাম। অনেক দিনের পর আজ হাসিলাম।

তার পর গৃহিণী আহারে বসিলেন। বসিয়া থাকিয়া যত্নপূর্বক তাঁহাকে ব্যঞ্জনগুলি খাওয়াইলাম। মাগী গিলিল অনেক। শেষ বলিল, "রাঁধ ভাল ত গা! কোথায় রান্না শিখিলে?"

আমি বলিলাম, "বাপের বাড়ী।"

গৃহিণী। তোমার বাপের বাড়ী কোথায় গা? এ ত বড়মানুষের ঘরের মত রান্না। তোমার বাপ কি বড়মানুষ ছিলেন?

আমি। তা ছিলেন।

গৃহি। তবে তুমি রাঁধিতে আসিয়াছ কেন?

আমি। দুরবস্থায় পড়িয়াছি।

গৃহি। তা আমার কাছে থাক, তুমি বড়মানুষের মেয়ে, আমার ঘরে তেমনই থাকিবে।

সুভাষিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌমা, দেখো গো, এঁকে যেন কেউ কড়া কথা না বলে—আর তুমি ত বল্‌বেই না, তুমি ত তেমন মানুষের মেয়ে নও।"

তার পর সুভাষিণী খাইতে বসিল। আমিও তার কাছে খাইতে বসিলাম। খাইতে খাইতে সে জিজ্ঞাসা করিল।

এখন আমার শাশুড়ীকে বুঝিতে পারিলে ত?

আমি বলিলাম, "কাঙ্গালের আর বড়মানুষের মেয়ের সঙ্গে সকলেই একটু প্রভেদ করে।"

সুভাষিণী হাসিয়া উঠিল। বলিল, "এই বুঝি বুঝিয়াছ? তুমি বড় মানুষের মেয়ে ব'লে বুঝি তোমায় আদর করেছেন?"

আমি বলিলাম, "তবে কি?"

সুভা। ওঁর ছেলে পেট ভ'রে খাবে, তাই তোমার এত আদর। এখন যদি তুমি একটু কোট কর, তবে তোমার মাহিনা ডবল হইয়া যায়।

আমি বলিলাম, "আমি মাহিনা চাই না। মাহিনা লইয়া তোমার নিকট রাখিব, তুমি কাঙ্গাল গরীবকে দিও। আমি আশ্রয় পাইয়াছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

———



নবম পরিচ্ছেদ

পাকা চুলের সুখ-দুঃখ

আমি আশ্রয় পাইলাম। আর পাইলাম—একটি হিতৈষিণী সখী। সুভাষিণী আপনার ভগিনীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিতে হয়, আমার সঙ্গে তেমনই ব্যবহার করিত। সে বুড়ী ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণী—তাঁহার নাম সোনার মা,— তিনি বাড়ী গেলেন না। মনে করিলেন, তিনি গেলে আর চাকরীটি পাইবেন না, আমি কায়েমী হইব।

১২শ পরিচ্ছেদ

তিনি এই ভাবিয়া নানা ছুতা করিয়া বাড়ী গেলেন না। সুভাষিণীর সুপারিসে আমরা দুই জনেই রহিলাম। তিনি শাশুড়ীকে বুঝাইলেন যে, কুমুদিনী ভদ্রলোকের মেয়ে, একা সব রান্না পারিয়া উঠিবে না—আর সোনার মা বুড়া-মানুষই বা কোথা যায়? শাশুড়ী বলিল, "দুই জনকেই কি রাখিতে পারি? এত টাকা যোগায় কে?"

বধূ বলিল, "তা এক জনকে রাখিতে হ'লে সোনার মাকে রাখিতে হয়। কুমু এত পারবে না।"

গৃহিণী বলিলেন, "না না। সোনার মা'র রান্না আমার ছেলে খেতে পারে না। তবে দুই জনই থাক।"

আমার কষ্ট নিবারণ জন্য সুভাষিণী এই কৌশলটুকু করিল।

আমি মাছ-মাংস রাঁধি—বা দুই একখানা ভাল ব্যঞ্জন রাঁধি—বাকি সময়টুকু সুভাষিণীর সঙ্গে গল্প করি—তার ছেলে-মেয়ের সঙ্গে খেলা করি; গৃহিণীর বিশ্বাস, তাঁর বয়স কাঁচা, কেবল অদৃষ্টদোষে গাছকতক চুল পাকিয়াছে, এই জন্যই তিনি লোক পাইলেই এবং অবসর পাইলেই পাকা চুল তুলাইতে বসিতেন। এক দিন আমাকে ধরিলেন। আমি কিছু ক্ষিপ্রহস্ত, শীঘ্র শীঘ্রই ভাদ্রমাসের উলুক্ষেত্র সাফ করিতেছিলাম। দূর হইতে দেখিতে পাইয়া সুভাষিণী আমাকে অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে ডাকিল।

বলিল, "ও কি কাণ্ড! আমার শাশুড়ীকে নেড়া-মুড়া করিয়া দিতেছ কেন?"

আমি বলিলাম, "ও পাপ এক দিনে চুকানই ভাল।"

সুভা। তা হ'লে কি টেঁকতে পারবে?

আমি। আমার হাত থামে না যে।

সুভা। দুই একগাছি তুলে চ'লে আসতে পার না ?

আমি। তোমার শাশুড়ী যে ছাড়ে না।

সুভা। বল গে যে, কৈ পাকা চুল ত বেশী দেখিতে পাই না— এই ব'লে চ'লে এসো।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এমন দিনে-ডাকাতি কি করা যায় ? লোকে বল্‌বে কি ? এ যে আমার কালাদীঘির ডাকাতি।"

সুভা। কালাদীঘির ডাকাতি কি ?

হঠাৎ কালাদীঘির কথা অসাবধানে মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল। কথাটা চাপিয়া গেলাম। বলিলাম, "সে গল্প আর এক দিন করিব।"

হাসিতে হাসিতে আমি গিন্নীর কাছে গিয়া আবার পাকাচুল তুলিতে বসিলাম। দুই চারিগাছা তুলিয়া বলিলাম, "কৈ, আর বড় পাকা দেখিতে পাই না। দুই একগাছা রহিল, কা'ল তুলে দিব।"

মাগী এক গাল হাসিল। বলিল, "আবার বেটীরা বলে সব চুলই পাকা।"

সে দিন আমার আদর বাড়িল। কিন্তু যাহাতে দিন দিন বসিয়া পাকা চুল তুলিতে না হয়, সে ব্যবস্থা করিলাম, বেতনের টাকা পাইয়াছিলাম, তাহা হইতে একটা টাকা হারাণীর হাতে দিলাম ; বলিলাম, "একটা টাকায় এক শিশি কলপ কারও হাত দিয়া কিনিয়া আনিয়া দে।"

হারাণী কাজের লোক। শীঘ্র এক শিশি উত্তম কলপ আনিয়া দিল। আমি তাহা হাতে করিয়া গিন্নীর পাকা চুল তুলিতে গেলাম।

গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতে কি ও ?"

আমি বলিলাম, "একটা আরক। এটা চুলে মাখাইলে সব পাকা চুল উঠিয়া আসে, কাঁচা চুল থাকে।"

গৃহিণী বলিলেন, "বটে, এমন আশ্চর্য আরক ত কখন শুনি নাই। ভাল, মাখাও দেখি। দেখিও, কলপ দিও না যেন।"

আমি উত্তম করিয়া তাঁহার চুলে কলপ মাখাইয়া দিলাম। তাঁহার সমস্ত চুলগুলি কাল হইয়া গেল। দুর্ভাগ্য বশতঃ হারাণী ঘর ঝাঁট দিতে দিতে তাহা দেখিতে পাইল। তখন সে ঝাঁটা ফেলিয়া দিয়া, মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিতে হাসিতে সদর-বাড়ী চলিয়া গেল। সেখানে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইলে, সে আবার ভিতর বাড়ীতে আসিয়া মুখে কাপড় গুঁজিতে গুঁজিতে ছাদের উপর চলিয়া গেল। সেখানে সোনার মা চুল শুকাইতেছিল ; সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ?" হারাণী হাসির জ্বালায় কথা কহিতে পারিল না ; হাত দিয়া মাথা দেখাইতে লাগিল। সোনার মা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, নীচে আসিয়া দেখিল যে, গৃহিণীর মাথার চুল সব কাল—সে বলিল,—"ও মা! এ কি, তোমার মাথার সব চুল কালো হয়ে গেছে গো! ও মা! কে না জানি তোমায় ওষুধ করিল।"

গৃহিণী আমাকে তলব করিলেন ; বলিলেন, "হাঁ গা কুমো! তুমি কি আমার মাথায় কলপ দিয়াছ ?"

দেখিলাম, গৃহিণীর মুখখানা বেশ প্রসন্ন। আমি বলিলাম, "ও কলপ নয় মা, আমার ওষুধ।"

গৃ। তা বেশ ওষুধ বাছা! আরসি একখানা আন দেখি।

একখানা আরসি আনিয়া দিলাম। দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ও মা! সব চুল কালো হয়ে গেছে।"

গৃহিণীর মুখে হাসি ধরে না। সে দিন সন্ধ্যার পর আমার রান্নার সুখ্যাতি করিয়া আমার বেতন বাড়াইয়া দিলেন আর বলিলেন, "বাছা! কেবল কাচের চুড়ি হাতে দিয়া বেড়াও, দেখিয়া কষ্ট হয়।" এই বলিয়া তিনি নিজের বহুকালপরিত্যক্ত এক জোড়া সোনার বালা আমায় বখশিস করিলেন।

একটু অবসর পাইয়া বুড়া বামুন ঠাকুরাণী আমাকে ধরিল। বলিল, "বলি, সে ওষুধটা আর আছে, যাতে চুল কালো হয়?"

আমি। আছে বৈ কি।

আমি কলপের শিশি বামুন ঠাকুরাণীকে দিয়া গেলাম। ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী রাত্রিতে শয়নকালে, অন্ধকারে, তাহা চুলে মাখাইতেছিলেন; কতক চুলে লাগিয়াছিল, কতক চুলে লাগে নাই, কতক বা মুখে চোখে লাগিয়াছিল। সকালবেলা যখন তিনি দর্শন দিলেন, তখন চুলগুলা পাঁচরঙ্গা বেড়ালের লোমের মত কিছু রাঙ্গা, কিছু কালো, আর মুখখানির কতক মুখপোড়া বাঁদরের মত, কতক মেনি-বিড়ালের মত। দেখিবামাত্র পৌরবর্গ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। সে হাসি আর থামে না। যে যখন পাচিকাকে দেখে, সে তখনই হাসিয়া উঠে।

হাসি দেখিয়া তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"তোমরা কেন হাসছ গা?"

তিনি সেই অবস্থায় রমণবাবুকে অন্ন দিতে গেলেন। রমণবাবু দেখিয়া হাসি চাপিতে গিয়া বিষম খাইলেন, আর তাঁহার খাওয়া

হইল না। শুনিলাম, রামরাম দত্তকে অন্ন দিতে গেলে কর্তা মহাশয় তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

শেষে সুভাষিণী বুড়ীকে বলিয়া দিল, "আমার ঘরে বড় আয়না আছে। মুখ দেখ গিয়া।"

বুড়ী গিয়া মুখ দেখিল। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, আমি চুলে মাখাইতে বলিয়াছিলাম, মুখে মাখাইতে বলি নাই। বুড়ী তাহা বুঝিল না।

বুড়ী আছড়াইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

আশার প্রদীপ

সেইদিন বৈকালে সুভাষিণী বলিল, "তুমি সেই কালাদীঘির ডাকাতির গল্পটি বলিবে বলিয়াছিলে—আজ বল না শুনি।"

আমি অনেকক্ষণ ভাবিলাম। শেষে বলিলাম, "সে আমারই হতভাগ্যের কথা। আমার বাপ বড়মানুষ, এ কথা বলিয়াছি। তোমার শ্বশুরও বড়মানুষ। আমার বাপ আজিও আছেন—তাঁহার সেই অতুল ঐশ্বর্য এখনও আছে, আজিও তাঁহার হাতীশালে হাতী বাঁধা। আমি যে রাঁধিয়া খাইতেছি, কালাদীঘির ডাকাইতি তাহার কারণ।"

আমি বাপের নাম বলিলাম না, বাপের বাড়ীর নাম বলিলাম না। স্বামীর বা শ্বশুরের নাম বলিলাম না, শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের নাম বলিলাম না, আর সমস্ত বলিলাম। বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলাম।

পরদিন সুভাষিণী আমাকে বলিল, "বাপের নাম বলিতে হইবে। তাঁর বাড়ী যে গ্রামে, তাহাও বলিতে হইবে।"

বলিলাম।

সু। ডাকঘরের নাম বল।

আমি। ডাকঘর! ডাকঘরের নাম ডাকঘর।

সু। বলি, যে গ্রামে তোমাদের বাড়ী, সেই গ্রামেই ডাকঘর আছে, না অন্য গ্রামে?

আমি। তা ত জানি না।

সুভাষিণী আর কিছু বলিল না। পরদিন বলিল, "তুমি বড়-ঘরের মেয়ে, কত কাল আর রাঁধিয়া খাইবে? তুমি গেলে আমি কাঁদিব—কিন্তু আমার সুখের জন্য তোমার ক্ষতি করি, এমন পাপিষ্ঠা আমি নই। আমরা পরামর্শ করিয়াছি—"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমরা কে কে?"

সু। আমি আর র-বাবু!

র-বাবু কি না রমণ বাবু। সুভাষিণী বলিতে লাগিল, "পরামর্শ করিয়াছি যে, তোমার বাপকে পত্র লিখিব, তাই কা'ল ডাকঘরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। এখন মহেশপুরেই ডাকঘর আছে, বিবেচনা করিয়া পত্র লেখা হইল।

আমি। পত্র লেখা হইয়াছে নাকি?

সু। হাঁ।

আমি আহ্লাদে দিন গণিতে লাগিলাম, কতদিনে পত্রের উত্তর আসিবে? কিন্তু উত্তর আসিল না। মহেশপুরে কোন ডাকঘর ছিল না। ডাকঘরের ঠিকানা না পাইয়া কলিকাতার বড় ডাকঘরে রমণবাবুর চিঠি খুলিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিল।

আমি আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। সুভাষিণী বলিল, "এখন স্বামীর নাম বলিতে হইবে।"

আমি স্বামীর নাম লিখিয়া দিলাম।

"শ্বশুরের নাম"?

তাও লিখিলাম।

"গ্রামের নাম?"

তাও বলিয়া দিলাম।

"ডাকঘরের নাম?"

বলিলাম, "তা কি জানি?"

শুনিলাম, রমণবাবু সেখানেও পত্র লিখিলেন। কিন্তু কোন ত্তর আসিল না। বড় বিষণ্ণ হইলাম।

আমি এখন বুঝিলাম যে, আমার আর ভরসা নাই। আমি শয্যা লইলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

একটা চোরা চাহনি

রমণবাবু উকীল। তাঁহার একজন বড় মোয়াক্কেল ছিল। শুনিতেছিলাম, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। রমণবাবু ও তাঁহার পিতা তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত কারবার-ঘটিত কিছু সম্বন্ধ ছিল। আজ শুনিলাম, তাঁহাকে মধ্যাহ্নে আহারের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাই বিশেষ আয়োজন হইতেছে!

রান্না ভাল চাই—অতএব পাকের ভারটা আমার উপর পড়িল। যত্ন করিয়া পাক করিলাম। আহারের স্থান অন্তঃপুরেই হইল। রামরামবাবু, রমণবাবু ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আহারে বসিলেন।

বুড়ী পরিবেশন করিতেছে—আমি রান্নাঘরে আছি—এমন সময়ে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। রমণ বাবু বুড়ীকে ধমকাইতেছিলেন। রান্নাঘরের ঝি আসিয়া বলিল, "ইচ্ছে ক'রে লোককে অপ্রতিভ করা।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে?"

ঝি বলিল, "বুড়ী দাদাবাবুর বাটিতে ডাল দিতেছিল—তিনি তা দেখেও উহুঁ উহুঁ ক'রে হাত বাড়িয়ে দিলেন, সব ডাল হাতে পড়িয়া গেল।"

আমি এদিকে শুনিতেছিলাম, রমণ বাবু বামনীকে ধমকাইতেছিলাম—"পরিবেশন করতে জান না ত এস কেন? আর কাকেও থাল দিতে পারনি?"

রামরাম বাবু বলিলেন, "তোমার কর্ম নয়। কুমোকে পাঠাইয়া দাও গিয়া।"

খোদ কর্তার হুকুম অমান্য করি কি প্রকারে? কাজেই, আমি হাত ধুইয়া, কাপড়খানা গুছাইয়া পরিয়া, একটু ঘুমটা টানিয়া পরিবেশন করিতে গেলাম।

ঘোমটার ভিতর হইতে একবার নিমন্ত্রিত বাবুটিকে দেখিয়া লইলাম।

দেখিলাম, তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর বোধ হয়। তিনি গৌরবর্ণ এবং অত্যন্ত সুপুরুষ; আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহাকে দেখিতেছিলাম, এমত সময়ে তিনি মুখ তুলিলেন—দেখিতে পাইলেন যে, আমি ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছি। তিনি মৃত্ব হাসিয়া মুখ নত করিলেন। আমি চলিয়া আসিলাম।

আমি একটু লজ্জিতা হইলাম।

পাকশালায় ফিরিয়া আসিয়া আমার যেন মনে হইল, আমি ইহাকে পূর্বে কোথাও দেখিয়াছি। সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আবার অন্তরাল হইতে ইহাকে বিশেষ করিয়া দেখিলাম। দেখিয়া মনে মনে বলিলাম, "চিনিয়াছি।"

রামরাম বাবু আবার অন্যান্য খাদ্য লইয়া যাইতে ডাকিয়া বলিলেন। মাংস লইয়া গেলাম। ইনি রামরাম দত্তকে বলিলেন, "রামরাম বাবু, আপনার পাচিকাকে বলুন যে, পাক অতি পরিপাটি হইয়াছে।"

রামরাম বাবু বলিলেন, "হাঁ, উনি রাঁধেন ভাল।"

নিমন্ত্রিত বাবু কহিলেন, “কিন্তু এ বড় আশ্চর্য যে, আপনার বাড়ীতে দুই একখানা ব্যঞ্জন আমাদের দেশের মত পাক হইয়াছে।

রামরামবাবু বলিলেন, “তা হবে, ওঁর বাড়ী এ দেশে নয়।”

ইনি এবার আমার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, “তোমাদের বাড়ী কোথায় গা ?”

আমি উত্তর করিলাম, “আমার বাড়ী কালাদীঘি।”

তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, কোন্ কালাদীঘি, ডাকাতে কালাদীঘি ?”

আমি বললাম, “হাঁ।”

তিনি আর কিছু বলিলেন না।

আমি মাংসপাত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রইলাম, রামরাম দত্ত বলিলেন, “উপেন্দ্র বাবু। আহার করুন না।” ঐটি শুনিবার আমার বাকী ছিল। উপেন্দ্র বাবু! আমি নাম শুনিবার আগেই চিনিয়াছিলাম, ইনি আমার স্বামী।

আমি পাকশালায় গিয়া পাত্র ফেলিয়া অনেক কালের পর আহ্লাদ করিতে বসিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হারাণীর হাসি বন্ধ

মনে মনে স্থির করিলাম, "যদি বিধাতা হারাধন মিলাইয়াছেন—তবে ছাড়া হবে না। লজ্জা করিয়া সব নষ্ট না করি।"

আমি তখন হারাণীর শরণাগত হইব মনে করিলাম। নিভৃতে ডাকিবামাত্র সে হাসিতে হাসিতে আসিল।

আমি বলিলাম, "আমার জন্মের শোধ একবার উপকার কর। ঐ বাবুটি কখন যাইবেন, আমাকে শীঘ্র খবর আনিয়া দে।"

হারাণী গম্ভীরভাবে বলিল, "ছি দিদিঠাকরুণ! কিছুতেই আমা হইতে এ কাজ হইবে না ?"

আমি খালি হাতে হারাণীর কাছে আসি নাই। মাহিয়ানার টাকা ছিল, পাঁচটা তাহার হাতে দিলাম। বলিলাম, "আমার মাথা খাস্, এ কাজ তোকে করিতেই হইবে।"

হারাণী টাকা কয়টা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিল, কিন্তু তাহা না দিয়া নিকটে উনান নিকাইবার এক ঝুড়ি মাটি ছিল, তাহার উপর রাখিয়া দিল। বলিল, "তোমার টাকা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিলাম, কিন্তু শব্দ হইলে একটা কেলেঙ্কারী হইবে, তাই আস্তে আস্তে এইখানে রাখিলাম—কুড়াইয়া লও। আর এ সকল কথা মুখে এনো না।"

আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। তার দয়া হইল। সে বলিল, “কাঁদ কেন? চেনা মানুষ না কি?”

আমি একবার মনে করিলাম, হারাণীকে সব খুলিয়া বলি। তার পর ভাবিলাম, সে এত বিশ্বাস করিবে না, একটা বা গণ্ডগোল করিবে। হারাণীকে বলিলাম, “চেনা মানুষ বটে—বড় চেনা, সকল কথা শুনিলে তুই বিশ্বাস করিবি না, তাই তোকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম না। কিছু দোষ নাই।”

হা। তোমাকে কি তার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে?

আমি। হাঁ।

হা। কখন্?

আমি। রাত্রে সবাই ঘুমাইলে।

হা। আমার বাপের সাধ্য নহে।

আমি। আর বৌঠাকুরাণী যদি হুকুম দেন? যাবি?

হা। যাব।

আমি তখন সুভাষিণীর সন্ধানে গেলাম। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া সুভাষিণী জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন, চিনিয়াছ ত?”

আমি আকাশ থেকে পড়িলাম। বলিলাম, ”সে কি? তুমি কি ক’রে জান্‌লে?” সুভাষিণী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, “আহা, তোমার সোনার চাঁদ বুঝি আপনি এসে ধরা দিয়েছে? আমরা ফাঁদ পাততে জানি, তাই তোমার আকাশের চাঁদ ধ’রে এনে দিয়েছি। তুমি তোমার স্বামীর, শ্বশুরের আর তাঁদের গাঁয়ের নাম বলিয়া দিয়াছিলে মনে আছে? তাই শুনিয়াই বাবু চিনিতে পারিলেন। তোমার উ-বাবুর একটা বড় মোকদ্দমা তাঁর হাতে ছিল—তার ছল করিয়া

তোমার উ-বাবুকে কলিকাতায় আসিতে লিখিলেন। তার পর নিমন্ত্রণ।"

আমি। তার পর হাত পাতিয়া বুড়ীর ডালটুকু নেওয়া।

সুভা। হাঁ, সেটাও আমাদের ষড়যন্ত্র।

আমি। তা আমার পরিচয় কিছু দেওয়া হয়েছে কি?

সুভা। তা কি দেওয়া যায়? তোমাকে ডাকাতে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার পর কোথায় গিয়েছিলে কি বৃত্তান্ত, তা কে জানে? তোমার পরিচয় পেলে কি ঘরে নেবে? এখন তুমি নিজে যা করতে পার।

আমি। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা না হইলে কি করিব।

সুভা। কখন্ দেখা কর্‌বে, কোথায় বা দেখা করবে?

আমি। এইখানেই দেখা করিতে হইবে।

সুভা। কখন্?

আমি। রাত্রে।

সুভা। কিন্তু তাহা হইলে তাঁকে রাত্রে আটকাইতে হয়। দেখি একবার বাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে।

সুভাষিণী রমণ বাবুকে ডাকাইল। তাঁর সঙ্গে যে কথাবার্তা হইল, তাহা আমাকে আসিয়া বলিল, "র-বাবু মোকদ্দমার কাগজ-পত্র সন্ধ্যার পর তোমার স্বামী আসিলে দেখিবেন। কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে একটু রাত্রি করিবেন। রাত্রি হইলে আহারের জন্য অনুরোধ করিবেন। কিন্তু তার পর তোমার বিদ্যায় যা থাকে, তা করিও।"

আমি বলিলাম, "একছত্র লিখিয়া দিব। সেই কাগজটুকু কেহ

তাঁহার কাছে দিয়ে এলেই হয়। হারাণীকে বলিয়াছিলাম সে নারাজ। তবে তোমার একটি ইঙ্গিত পাইলে সে যাইতে পারে। তুমি যদি বারণ না কর, তবে সে যাইতে পারে।”

সুভাষিণী বলিল, “সন্ধ্যার পর তাকে আসিতে বলিও।”

———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আমাকে একজামিন দিতে হইল

সন্ধ্যার পর আমার স্বামী কাগজপত্র লইয়া রমণবাবুর কাছে আসিলেন। সংবাদ পাইয়া আমি আর একবার হারাণীর হাতে-পায়ে ধরিলাম।

হারাণী হাসিতে হাসিতে সুভাষিণীর কাছে ছুটিল। আমি তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, সে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিয়া আলু-থালু কেশবেশ সাম্‌লাইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি, এত হাসি কেন?"

হারাণী। দিদি, প্রাণটা গিয়াছিল আর কি! বৌদিদির ঘরে বৌদিদির হাতের কাছেই কে ঝাঁটা রাখিয়া আসিয়াছে। আমি যেমন গিয়া বলিলাম, অমনি বৌদিদি সেই ঝাঁটা লইয়া আমাকে মারিতে আসিল। পালিয়ে বাঁচ্‌লেম। নইলে খেঙ্গরা খেয়ে প্রাণটা গিয়াছিল আর কি! তা এক ঘা বুঝি পিঠে পড়েছে,—দেখ দেখি, দাগ হয়েছে কি না?

হারাণী হাসিতে হাসিতে আমাকে পিঠ দেখাইল। মিছে কথা— দাগ ছিল না। তখন সে বলিল, "এখন, কি কর্‌তে হবে বল—ক'রে আসি।"

আমি তখন এক টুকরা কাগজে লিখিলাম, "আজ রাত্রিতে এই বাড়ীতে শয়ন করিবেন। ঘরের দ্বার যেন খোলা থাকে।—সেই পাচিকা।"

কাগজটা মুড়িয়া হারাণীকে দিলাম। সুভাষিণীকে বলিলাম, “একবার দাদাবাবুকে ডাকিয়া পাঠাও। যাহা হয়, একটা কথা বলিয়া বিদায় দিও।” সুভাষিণী তাই করিল। রমণ বাবু উঠিয়া আসিলে, হারাণীকে বলিলাম, “এখন যা।” হারাণী গেল; কিছু পরে কাগজটা ফেরত দিল। তার এক কোণে লেখা আছে, “আচ্ছা!” আমি তখন হারাণীকে বলিলাম, “যদি এত করিলি, তবে আর একটা করিতে হউবে। রাত্রে আমাকে তার শুইবার ঘরটা দেখাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।”

হারাণী। আচ্ছা, কোন দোষ নাই ত?

আমি। কিছু না। উনি আর জন্মে আমার স্বামী ছিলেন!

হারাণী। আর জন্মে, কি এ জন্মে, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। যদি এ জন্মের হয়, তবে আমি পাঁচ শত টাকা বখ্‌শিশ নিব; নহিলে আমার ঝাঁটার ঘা ভাল হইবে না।

আমি সুভাষিণীর কাছে গিয়া এ সকল সংবাদ দিলাম। সুভাষিণী শাশুড়ীকে বলিয়া আসিল, “আজ কুমুদিনীর অসুখ হইয়াছে, সে রাঁধিতে পারিবে না।”

সোনার মা রাঁধিতে গেল। সুভাষিণী আমাকে লইয়া গিয়া ঘরে কপাট দিল। বলিল, “তোমায় সাজাইব।”

আমার মুখ পরিষ্কার করিয়া মুছাইয়া দিল। চুলে সুগন্ধ তৈল মাখাইয়া, যত্নে খোঁপা বাঁধিয়া দিল; আপনার একখানা পরিষ্কার মনোহর বস্ত্র লইয়া জোর করিয়া পরাইতে লাগিল। তার পর আপনার অলঙ্কাররাশি আনিয়া পরাইতে আসিল। আমি বলিলাম, “এ আমি কিছুতেই পারিব না।”

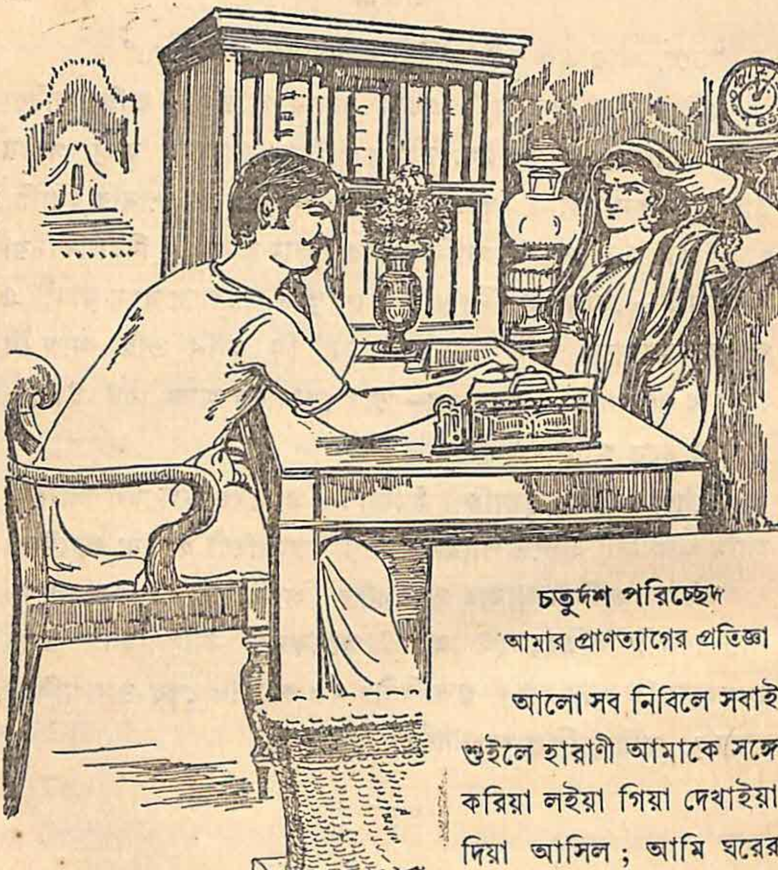
"তবে, আর এক স্যুট আনিয়া রাখিয়াছি, তাই পর।"

এই বলিয়া সুভাষিণী একটা ফুলের জার্ডিনিয়র বাহির করিয়া মল্লিকা-ফুলের বালা পরাইল, তাহার তাবিজ, তাহারই বাজু, গলায় তারই দোলন-মালা। তার পর এক জোড়া নূতন সোনার ইয়ারিং বাহির করিয়া বলিল, "এ আমি নিজের টাকায় র-বাবুকে দিয়া কিনিয়া আনিয়াছি—তোমাকে দিবার জন্য। তুমি যেখানে যখন থাক, এ পরিলে আমাকে তুমি মনে করিবে। কি জানি ভাই, আজ বৈ তোমার সঙ্গে যদি দেখা না হয়—তাই তোমাকে আজ এই ইয়ারিং পরাইব এতে আর 'না' বলিও না।"

বলিতে বলিতে সুভাষিণী কাঁদিল। আমারও চক্ষে জল আসিল, আমি আর 'না' বলিতে পারিলাম না। সুভাষিণী ইয়ারিং পরাইল।

তখন সুভাষিণী আমার গলা ধরিল, আমি তার গলা ধরিলাম। গলা-ধরাধরি করিয়া, দুই জনে অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। এমন ভালবাসা কি আর হয়? সুভাষিণীর মত আর কি কেহ ভালবাসিতে জানে? মরিব, কিন্তু সুভাষিণীকে ভুলিব না।

———



চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

আমার প্রাণত্যাগের প্রতিজ্ঞা

আলো সব নিবিলে সবাই শুইলে হারাণী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া দেখাইয়া দিয়া আসিল ; আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, তিনি একাই শয়ন করিয়া আছেন। ঘরে দুইটা বড় বড় আলো জ্বলিতেছে। প্রথম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলাম, কিছুতেই কথা ফুটিল না। গলা শুকাইতে লাগিল। কথা আসিল না, কাঁদিয়া ফেলিলাম।

তিনি বলিলেন, “কাঁদ কেন ?”

মনে করিলাম, এখন পরিচয় দিই—কিন্তু তখনই মনে হইল যে, পরিচয় দিলে যদি ইনি না বিশ্বাস করেন, যদি মনে করেন যে, ইহার বাড়ী কালাদীঘি, অবশ্য আমার স্ত্রী-হরণের বৃত্তান্ত শুনিয়াছে, এক্ষণে ঐশ্বর্য-লোভে আমার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতেছে,—তাহা হইলে কি প্রকারে ইহার বিশ্বাস জন্মাইব ? সুতরাং পরিচয় দিলাম না। তিনি বলিলেন, "কালাদীঘিতে যে এমন সুন্দরী জন্মিয়াছে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না।"

তাঁর কথার উত্তরে আমি বলিলাম, "আমি সুন্দরী না বান্দরী। আমাদের দেশের মধ্যে আপনার স্ত্রীরই সৌন্দর্যের গৌরব! তাঁহার কি কোন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ?

উত্তর। না—তুমি কত দিন দেশ হইতে আসিয়াছে ?

আমি বলিলাম, "আমি সেই ব্যাপারের পরই দেশ হইতে আসিয়াছি। আপনি আবার বিবাহ করিয়াছেন ?"

উত্তর। না।

সপত্নী হয় নাই, শুনিয়া বড় আহ্লাদ হইল! বলিলাম, "আপনারা যেমন বড়লোক, এটি তেমনই বিবেচনার কাজ হইয়াছে। নহিলে যদি এর পর আপনার স্ত্রীকে পাওয়া যায়, তবে দুই সতীনে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি বাধিবে।"

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে ভয় নাই। সেই স্ত্রীকে পাইলেও আমি গ্রহণ করিব, এমন বোধ হয় না।"

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তবে আমার পরিচয় পাইলে, আমাকে আপন স্ত্রী বলিয়া চিনিলেও, আমাকে গ্রহণ করিবেন না।

সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি এখন তাঁহার দেখা পান, কি করিবেন ?"

তিনি বলিলেন, "তাকে ত্যাগ করিব।"

আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। সেই রাত্রিতে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, "ইনি আমায় স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কুলের বাহিরে

আমি তাঁর সঙ্গে প্রফুল্ল হইয়া কথা কহিতে লাগিলাম। বলিলাম, "আপনার নিকট দেশের সংবাদ শুনিব বলিয়াই আসিয়াছি। আমি চলিলাম।"

আমি সত্যই গাত্রোত্থান করিলাম।

আমি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম। তিনি ডাকিলেন, "আমার কথা রাখ, যাইও না। এমন রূপ আমি কখনও দেখি নাই, আর একটু দেখি। এমন আর কখন দেখিব না।" আমি ফিরিলাম বলিলাম, "আমি না বুঝিয়া, না ভাবিয়া, আপনার কাছে আসিয়াছি ; না বুঝিয়া, না ভাবিয়া আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া আবার চলিলাম—দ্বার পর্যন্ত আসিলাম তখন তিনি আমার পথরোধ করিলেন। বলিলেন, "আমি এমন যে আর কখন দেখি নাই।" আমার দুঃখ হইল। বলিলাম, "তবে তোমার বাসায় চল—এখানে থাকিলে তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে।"

তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তাঁহার বাসা অল্পদূর। তাঁর গাড়ীও হাজির ছিল। আমরা নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। তাঁর বাসায় গিয়া দেখিলাম, দুই মহল বাড়ী। একটি ঘরে আমি আগে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই

ভিতর হইতে অর্গল রুদ্ধ করিলাম। স্বামী বাহিরে পড়িয়া রহিলেন।

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "আমি এখন তোমারই দাসী হইলাম। কা'ল তোমার সঙ্গে আবার আলাপ করিব। আজ এই পর্যন্ত।"

আমি দ্বার খুলিলাম না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

খুন করিয়া ফাঁসি গেলাম

আমি সর্বদা স্বামীর কাছে কাছে থাকিতাম। যাহাতে তাঁহার আহারের পারিপাট্য, শয়নের পারিপাট্য, স্নানের পারিপাট্য হয়, সর্বাংশে যাহাতে তিনি ভাল থাকেন, তাহাই করিতে আরম্ভ করিলাম ;—স্বহস্তে পাক করিতাম। খড়িকাটি পর্যন্ত স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম। তাঁর এতটুকু অসুখ দেখিলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেবা করিতাম।

ইনি আমার স্বামী—পতিসেবাতেই আমার আনন্দ—তাই প্রাণ ভরিয়া পতিসেবা করিতেছিলাম। ইহাতে কি পরিমাণে সুখী হইতেছিলাম, তা তোমরা কেহ বুঝিবে না।

মনে মনে স্থির করিলাম, তিনি আমাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেও যাইব না। পরিণামে তিনি আমার পরিচয় পাইয়াও যদি আমাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ না করেন, এই ভয়ে অবসর পাইলেই কাঁদিতে বসিতাম।

———

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ফাঁসির পর মোকদ্দমার তদারক

আমরা কলিকাতায় দিন কতক রহিলাম। তার পর এক দিন একখানা চিঠি হাতে করিয়া তিনি বলিলেন, "বাড়ী হইতে চিঠি আসিয়াছে, বাড়ী যাইতে হইবে।"

আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "আমি ?"

তিনি বলিলেন, "সেই কথাই আমিও ভাবিতেছিলাম।"

আমি। সেখানে আমাকে কি বলিয়া পরিচিত করিবে ?

তিনি। তাই ভাবিতেছি।

আমি। না গেলেই নয় ?

তিনি। না গেলেই নয়।

আমি। কত দিনে ফিরিবে ?

তিনি। শীঘ্র ফিরিতে পারিব, এমন ভরসা নাই। কলিকাতায় আমরা কালে-ভদ্রে আসি।

তিনি আমাকে আর কথা কহিতে দিলেন না। বলিলেন, "আজ আর এ কথায় কাজ নাই। আজ ভাবি। যা ভাবিয়া স্থির করিব, কাল বলিব।"

বৈকালে তিনি রমণবাবুকে আসিতে লিখিলেন, "গোপনীয় কথা আছে। এখানে না আসিলে বলা হইবে না।"

রমণ বাবু আসিলেন। আমি কপাটের আড়াল হইতে শুনিতে লাগিলাম, কি কথা হয়। স্বামী বলিলেন—"আপনাদিগের সেই পাচিকাটি—যে অল্পবয়সী—তাহার নাম কি ?"

রমণ। কুমুদিনী।

উপেন্দ্র। তাহার বাড়ী কোথায় ?

রমণ। এখন বলিতে পারি না।

উ। সধবা না বিধবা ?

র। সধবা।

উ। তাহার স্বামী কে জানেন ?

র। জানি।

উ। কে ?

র। এক্ষণে বলিবার আমার অধিকার নাই।

উ। আপনারা উহাকে কোথায় পাইলেন ?

র। আমার স্ত্রী তাহার মাসীর কাছে উহাকে পাইয়াছেন।

উ। উহার চরিত্র কেমন ?

র। অনিন্দনীয়। এমন চরিত্র দেখা যায় না।

উ। উহার বাড়ী কোথায়, কেন বলিতেছেন না ?

র। বলিবার অধিকার নাই।

উ। স্বামীর বাড়ী কোথায় ?

র। ঐ উত্তর।

উ। স্বামী জীবিত আছে ?

র। আছে।

উ। আপনি তাহাকে চিনেন ?

র। চিনি।

উ। স্ত্রীলোকটি এখন কোথায় ?

র। আপনার এই বাড়ীতে।

স্বামী মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন ?"

র। আমার বলিবার অধিকার নাই।

উ। আচ্ছা, আপনি ত সব জানেন দেখিতেছি। বলুন দেখি, আমি যে অভিসন্ধি করিতেছি, তাহা ঘটিতে পারে না কি ?

র। খুব ঘটিতে পারে।

উ। আর একটা কথা। আপনি কুমুদিনীর সম্বন্ধে যাহা জানেন, তাহা সব একটা কাগজে লিখিয়া দিয়া দস্তখত করিয়া দিতে পারেন ?

র। পারি—এক সর্তে। আমি লিখিয়া পুলিন্দায় সীল করিয়া কুমুদিনীর কাছে দিয়া যাইব। আপনি এক্ষণে তাহা পড়িতে পারিবেন না। দেশে গিয়া পড়িবেন।

অন্যান্য কথার পর রমণ বাবু উঠিয়া গেলেন।

———

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ভারি জুয়াচুরির বন্দোবস্ত

সে দিন দিবা-রাত্রি আমার স্বামী অন্যমনে ভাবিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে স্নানাহ্নিকের পর জলযোগ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, "যা জিজ্ঞাসা করিব, সকল কথার প্রকৃত উত্তর দিবে?"

বলিলাম, "যাহা বলিব, সত্যই বলিব।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী জীবিত আছেন শুনিলাম। তাঁহার নাম ধাম প্রকাশ করিবে?"

আমি। এখন না, দিনকতক যাক।

তিনি। এখন কোথায় আছেন, বলিবে?

আমি। এই কলিকাতায়।

তিনি। তুমি কলিকাতায়, তোমার স্বামী কলিকাতায়, তবে তুমি তাঁর কাছে থাক না কেন?

আমি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নাই।

আমার স্বামী এই উত্তর শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এত বড় আশ্চর্যের কথা!"

আমি। দুর্দৈব সর্বত্র আছে।

তিনি। তিনি ভবিষ্যতে তোমার উপর কোন দাবি-দাওয়া করিবার সম্ভাবনা আছে কি?

আমি। আমি যদি তাঁর কাছে আত্মপরিচয় দিই, তবে কি হয় বলা যায় না।

তিনি। তবে তোমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলি। তুমি কি পরামর্শ দাও, শুনি। আমাকে বাড়ী যাইতে হইবে। বাড়ী গেলে শীঘ্র ফিরিতে পারিব না। তোমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিব না। আমি তোমাকে লইয়া যাইব। তাই কালসমস্ত দিন ভাবিয়াছি।

আমি। বলিবে যে, এই ইন্দিরা, রামরাম দত্তের বাড়িতে খুঁজিয়া পাইয়াছি?

তিনি। ইন্দিরা নাম জানিলে কি প্রকারে? আর আমার মনের গুপ্ত অভিপ্রায় বা জানিলে কি প্রকারে?

আমি। সে দিন তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে, তোমার স্ত্রীকে পাওয়া গেলেও তুমি গ্রহণ করিবে না, তাহাকে ডাকাতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে; তোমার জাতি যাইবে।

তিনি। কালাদীঘিতে যাহারা ডাকাতি করিয়াছিল, তাহারা ধরা পড়িয়াছে। তাহারা একরারে বলিয়াছে, ইন্দিরার গহনাগাঁটি মাত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। কেবল এখন সে কোথায় আছে, কি হইয়াছে তাই কেহ জানে না; পাওয়া গেল একটা কলঙ্ক-শূন্য বৃত্তান্ত অনায়াসেই তৈয়ার করিয়া বলা যাইতে পারে! তাতেও যদি কোন কথা উঠে, গ্রামে কিছু সামাজিক দিলেই মিটিবে। আমাদের টাকা আছে—টাকায় সবাইকে বশীভূত করা যায়।

আমি। তবে আর আপত্তি কি?

তিনি। গোল তোমাকে লইয়া। তুমি জাল ইন্দিরা যদি ধরা পড়?

আমি। তোমাদের বাটীতে আমাকে কেহ চেনে না, আসল ইন্দিরাকেও কেহ চেনে না, কেন না, কেবল একবার বালিকাবয়সে তাকে তোমরা দেখিয়াছিলে, তবে ধরা পড়িব কেন ?

তিনি। কথায়—নূতন লোক গিয়া জানালোক সাজিলে কথায় ধরা পড়ে।

আমি। তুমি না হয় আমাকে সব শিখাইয়া পড়াইয়া রাখিবে।

তিনি। কিন্তু সব কথা ত শিখান যায় না। মনে কর, যদি যে কথা শিখাইতে মনে হয় নাই, এমন কথা পড়ে, তবে ধরা পড়িবে।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমায় কেহ ঠকাইতে পারে না।"

তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি যা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি। আমার স্ত্রীর নাম ইন্দিরা, তার বাপের নাম কি ?"

আমি। হরিমোহন দত্ত।

তিনি। তাঁহার বাড়ী কোথায় ?

আমি। মহেশপুর।

তিনি। তুমি বলিয়াছিলে, তোমার বাপের বাড়ী কালাদীঘি। কালাদীঘির লোক এ সকল জানিলে জানিতে পারে। এইবার বল, হরমোহন দত্তের বাড়ীর সদর দরওয়াজা কোন্ মুখ ?

আমি। দক্ষিণমুখ।

তিনি। তাঁর কয় ছেলে ?

আমি। এক।

তিনি। নাম কি ?

আমি। বসন্তকুমার।

তিনি। তার কয় ভগিনী ?

আমি। আপনার বিবাহের সময় দুইটি ছিল।

তিনি। নাম কি ?

আমি। ইন্দিরা আর কামিনী।

তিনি। তার বাড়ীর নিকট কোন পুকুর আছে ?

আমি। আছে। নাম দেবীদীঘি, তাতে খুব পদ্ম ফুটে।

তিনি। তুমি কখন মহেশপুরে ছিলে। তাই এত জান। বল দেখি ইন্দিরার বিবাহে সম্প্রদান কোথায় হয় ?

আমি। পূজার দালানের উত্তর-পশ্চিম কোণে।

তিনি। কে সম্প্রদান করে ?

আমি। ইন্দিরার খুড়া কৃষ্ণমোহন দত্ত।

তিনি। স্ত্রী-আচারকালে একজন আমার কান মলিয়া দিয়াছিল। তার নাম বল দেখি ?

আমি। বিন্দুঠাকুরাণী।

তিনি। ঠিক। বোধ হয়, তুমি বিবাহের দিন উপস্থিত ছিলে। ইন্দিরার বিবাহ কবে হইয়াছিল ?

আমি। —সালে বৈশাখ মাসের ২৭ তারিখে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে।

তিনি চুপ করিয়া ভাবিলেন। তার পর বলিলেন, "আমি আর দুইটা কথা জিজ্ঞাসা করিব ? বাসরঘরে সকলে উঠিয়া গেলে, আমি ইন্দিরাকে নির্জনে একটি কথা বলিয়াছিলাম, সে তাহার উত্তর দিয়াছিল। কি কথা সে বল দেখি ?"

আমি বলিলাম, "তুমি ইন্দিরাকে জিজ্ঞাসা করিলে, 'বল দেখি

আজ তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ হইল ?' ইন্দিরা বলিল, 'আজ হইতে তুমি আমার দেবতা হইলে, আমি তোমার দাসী হইলাম ."

স্বামী ধীরে ধীরে বালিসের উপর মাথা রাখিয়া চক্ষু বুজিলেন। আমি বলিলাম, "আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবে ?"

তিনি বলিলেন, "না। হয় তুমি স্বয়ং ইন্দিরা, নয় কোন মায়বিনী।"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যাধরী

আমি পরিচয় দিব না স্থির করিয়াছিলাম। তাই বলিলাম, "এখন আত্মপরিচয় দিব। কামরূপে আমার অধিষ্ঠান। আমি আদ্যাশক্তির মহামন্দিরে থাকি। লোকে আমাদিগকে ডাকিনী বলে; কিন্তু আমরা ডাকিনী নই। আমরা বিদ্যাধরী। আমি মহামায়ার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছিলাম, সেইজন্য অভিসম্পাত-গ্রস্ত হইয়া এই মানবরূপ ধারণ করিয়াছি। এক্ষণে আমার শাপ হইতে মুক্ত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। মহাভৈরবী দর্শন করিবামাত্র আমি মুক্তিলাভ করিব।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথায়?"

আমি বলিলাম, "মহাভৈরবীর মন্দির মহেশপুরে, তোমার শ্বশুরবাড়ীর উত্তরে। তাঁহাদেরই ঠাকুরবাড়ী। খিড়কি দিয়া যাতায়াতের পথ আছে। চল, মহেশপুরে যাই।"

তিনি ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি বুঝি আমার ইন্দিরাই হইবে।"

আমি। যেই হই, মহেশপুরে গেলেই সব গোল মিটিবে।

তিনি। তবে চল, কা'ল এখান হইতে যাত্রা করি। আমি তোমাকে কালাদীঘি পার করিয়া দিয়া নিজে বাড়ী যাইব।

তিনি সদরে গেলেন। সেখানে লোক আসিয়াছিল। লোক আর কেহ নহে, রমণ বাবু; আমার স্বামীর সঙ্গে আসিয়া আমাকে পুলিন্দা দিয়া গেলেন। আমার স্বামীকে যে সম্বন্ধে যে উপদেশ

দিয়াছিলেন, আমাকেও সেই উপদেশ দিলেন। শেষে বলিলেন, "সুভাষিণীকে কি বলিব।"

আমি বলিলাম, "বলিবেন, কা'ল আমি মহেশপুরে যাইব। গেলেই শাপ হইতে মুক্ত হইব।"

স্বামী বলিলেন, "আপনাদের এ সব জানা আছে কি?"

রমণ বাবু বলিলেন, "আমি সব জানি না, আমার স্ত্রী সব জানেন।"

বাহিরে আসিয়া স্বামী মহাশয় রমণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ডাকিনী, যোগিনী, বিদ্যাধরী প্রভৃতি বিশ্বাস করেন?"

রমণ বাবু রহস্যখানা কতক বুঝিয়াছিলেন, বলিলেন, "করি। সুভাষিণী বলেন, কুমুদিনী শাপগ্রস্ত বিদ্যাধরী।"

স্বামী বলিলেন, "কুমুদিনী কি ইন্দিরা, আপনার স্ত্রীকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন।"

রমণ বাবু আর দাঁড়াইলেন না। হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

———

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যাধরীর অন্তর্ধান

আমরা যথাকালে উভয়ে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলাম। তিনি আমাকে কালাদীঘি পার করিয়া দিয়া নিজালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সঙ্গের লোকজন আমাকে মহেশপুর লইয়া গেল, গ্রামের বাহিরে বাহক ও রক্ষকদিগকে অবস্থিতি করিতে বলিয়া আমি পদব্রজে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পিতার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই পিতাকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া আহ্লাদে বিবশ হইলেন।

আমি এত দিন কোথায় ছিলাম, কি প্রকারে আসিলাম—তাহা কিছু বলিলাম না। পিতা-মাতা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, "এর পর বলিব।"

সময়ান্তরে তাঁহাদিগকে বুঝিতে দিলাম যে, আমি স্বামীর নিকটেই ছিলাম, স্বামীর নিকট হইতেই আসিয়াছি এবং তিনিও দুই এক দিনের মধ্যে এখানে আসিবেন। সব কথা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কামিনীকে বলিলাম। কামিনী আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট, দুই বহিনে পরামর্শ আঁটিলাম। সকলকে শিখাইয়া ঠিক করিলাম!

পরদিন জামাতা আসিলেন। পিতামাতা তাঁহাকে যথেষ্ট আদর অপেক্ষা করলেন। আমি আসিয়াছি, একথা বাহিরে কাহারও কাছে তিনি শুনিলেন না। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। যখন অন্তঃপুরে জলযোগ করিতে আসিলেন, আমি সম্মুখে রহিলাম

না। কামিনী বসিল, আর দুই চারি জন জ্ঞাতিভগিনী বসিল। কামিনী অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পরিশেষে তিনি কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দিদি কোথায় ?"

কামিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি জানি কোথায় ? কালাদীঘিতে সেই যে সর্বনাশটা হইয়া গেল, তার পর ত আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমুদিনী বলিয়া কোন স্ত্রীলোক আসিয়াছিল কি ?"

কামিনী বলিল, "কুমুদিনী কি কে, তাহা বলিতে পারি না, একটা স্ত্রীলোক পরশুদিন পাল্কী করিয়া আসিয়াছিল বটে। সে বরাবর মহাভৈরবীর মন্দিরে গিয়া উঠিয়া দেবীকে প্রণাম করিল। অমনি একটা আশ্চর্য ব্যাপার হইল, হঠাৎ মেঘ হইয়া ঝড়বৃষ্টি হইল। সেই স্ত্রীলোকটা সেই সময় ত্রিশূল হাতে করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে আকাশে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেল।"

"যে স্থান হইতে কুমুদিনী অন্তর্ধান করিয়াছে, তাহা দেখিতে পাই না ?"

কামিনী বলিল, "পাও বৈ কি! অন্ধকার হয়েছে—আলো নিয়ে আসি।"

কামিনী আমাকে ইঙ্গিত করিয়া গেল—আমি আগে মন্দিরে গিয়া বারেন্দায় বসিয়া রহিলাম।

সেইখানে আলো ধরিয়া (খিড়কি দিয়া পথ আছে বলিয়াছি) কামিনী আমার স্বামীকে আমার কাছে লইয়া আসিল। তিনি আসিয়া আমার পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িলেন। ডাকিলেন,

"কুমুদিনি, কুমুদিনি! যদি—আসিয়াছ—ত আর আমায় ত্যাগ করিও না।"

তিনি এই কথা বলার পর কামিনী চটিয়া উঠিয়া বলিল, "আয় দিদি উঠে আয়। ও মিনষে কুমুদিনী চেনে, তোকে চেনে না।"

তিনি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি! দিদি কে?"

কামিনী রাগ করিয়া বলিল, "আমার দিদি। ইন্দিরে। কখনও নাম শোন নি?"

এই বলিয়া কামিনী আলোটা নিবাইয়া দিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আ।সল। আমরা ছুটিয়া আসিলাম। তিনি আমাদের পিছু পিছু ছুটিলেন; কিন্তু অন্ধকার, পথ অচেনা, একটা চৌকাট বাধিয়া একটা ছোট রকম আছাড় খাইলেন। আমরা নিকটেই ছিলাম, দুই জনে হাত ধরিয়া তুলিলাম! কামিনী চুপি চুপি বলিল, "আমরা বিদ্যাধরী, তোমার রক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছি!"

তাকে টানিয়া আনিয়া আমার শয্যাগৃহে উপস্থিত করিলাম। সেখানে আলো ছিল। তিনি আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "এ কি? এ ত কামিনী, আর এ ত কুমুদিনী।" কামিনী রাগে দশখানা হইয়া বলিল, "আঃ পোড়াকপাল! এই বুদ্ধিতে টাকা রোজগার করেছ? কোদাল পাড় না কি? এ কুমুদিনী না—ইন্দিরে—ইন্দিরে—ইন্দিরে!! তোমার পরিবার। আপনার পরিবার চিন্‌তে পার না!!!"

সে দিনের আহ্লাদের কথা বলিয়া উঠিতে পারি না। বাড়ীতে খুব উৎসব বাধিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সেকালে যেমন ছিল

কালাদীঘির ডাকাইতির পর আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, স্বামী মহাশয় এক্ষণে আমার কাছে সব শুনিলেন। রমণবাবু ও সুভাষিণী যেরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিল, তাহাও শুনিলেন। বলিলেন, "আমাকে এত ঘুরাইবার ফিরাইবার প্রয়োজনটা কি?" প্রয়োজনটা কি ছিল, তাহাও বুঝাইলাম। কামিনী বলিল, "তোমায় ঘানিগাছে ঘুরায় নাই, অমনি ছাড়িয়াছে, এইটুকু দিদির দোষ।"

উ-বাবু বলিলেন, "তখন চিনিতে পারিনি!"

কামিনী বলিল, "তুমি যে চিনিবে, বিধাতা তা কপালে লিখেন নাই, যাত্রায় শোন নি? বলে—

"ধবলী বলিল শ্যাম, কে চেনে তোমারে
চিনি শুধু কাঁচা ঘাস যমুনার ধারে॥
পদচিহ্ন খুঁজি তব বাঁশী শুনে কানে।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ তায়, গোরু কি জানে?"

উ-বাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "যা ভাই, আর জ্বালাস্ নে।"

আমার পিতামাতার অনুরোধে উ-বাবু আর একদিন থাকিতে সম্মত হইলেন। সে দিনও বড় আনন্দে গেল। দলে দলে পাড়ার মেয়ে আসিয়া সন্ধ্যার পর আমার স্বামীকে ঘেরিয়া মজলিস করিয়া বসিল। সেই প্রকাণ্ড পুরীর একটা কোণের ঘরে মেয়েদের মজলিস হইল।

কামিনী কথায় সকলকে জ্বালাইতে লাগিল। পান, পুষ্প, আতর বিলাইয়া সকলকে তুষ্ট করিতেছিল।

মিত্র মহাশয় বলিলেন, "কামিনী! ভাই, তোমার সঙ্গে কি-কথা ছিল?"

কামিনী। কি কথা ছিল মিত্র মহাশয়?

উ-বাবু। তুমি নাচিবে।

কা। আমি ত নেচেছি।

উ। কখন্ নাচলে?

কা। দুপুরবেলা। ঘরের ভিতর দোর বন্ধ ক'রে।

উ। তেমনতর ত কথা ছিল না।

কা। এমন কথাও ছিল না যে, তোমাদের সম্মুখে আসিয়া পেশওয়াজ পরিয়া নাচিব। নাচিব স্বীকার করিয়াছিলাম, তা নাচিয়াছি। আমার কথা রাখিয়াছি, তোমরা দেখিতে পাইলে না তোমাদের অদৃষ্টের দোষ!

কামিনী যদি নাচের দায়ে এড়াইল, তবে আমার স্বামী গানের জন্য ধরা পড়িলেন। মজলিস্ হইতে হুকুম হইল, তোমাকে গাইতে হইবে। তিনি পশ্চিমাঞ্চলে রীতিমত গীতবিদ্যা শিখিয়াছেন। তিনি সনদী খিয়াল গাইলেন।

এইরূপে দুই প্রহর রাত্রি কাটিল।

———

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

আমি পরদিন শিবিকারোহণে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী গেলাম।

সেখানে এবার নির্বিঘ্নে পৌঁছিলাম। স্বামী মহাশয় মাতা-পিতাসমীপে সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। রমণবাবুর পুলিন্দা খোলা হইল। তাঁহার কথার সঙ্গে আমার সকল কথা মিলিল। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী সন্তুষ্ট হইলেন। সমাজের লোকও কোন কথা তুলিল না।

আমি সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া সুভাষিণীকে পত্র লিখিলাম। সুভাষিণীর জন্য সর্বদা আমার প্রাণ কাঁদিত। আমার স্বামী আমার অনুরোধে রমণবাবুর নিকট হারাণীর জন্য পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। শীঘ্রই সুভাষিণীর উত্তর পাইলাম। সুভাষিণী লিখিয়াছিল, "হারাণী প্রথমে কিছুতেই টাকা লইবে না। অনেক বুঝান-পড়ানতে সে টাকা নিয়াছে। এখন নানারকম ব্রতনিয়ম করিবার ফর্দ করিয়াছে।"

পাচিকা ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণীর সংবাদ সুভাষিণী এইরূপ লিখিল, "যখন শুনিল যে, তুমি বড়মানুষের মেয়ে, বড়মানুষের বৌ, এখন আপনার ঘর পাইয়াছ, তখন বলিল, "আমি ত বরাবর বল্‌ছি মা, যে, সে বড়ঘরের মেয়ে, যেমন রূপ, তেমনই যেন লক্ষ্মী। সে ভাল থাকুক মা! ভাল থাকুক। আহা, হাঁ দেখ বৌদিদি, আমাকে কিছু পাঠাইয়া দিতে বলো'।"

গৃহিণী সম্বন্ধে সুভাষিণী লিখিল, "তিনি তোমার এই সকল সংবাদ পাইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন ; আর তোমার স্বামীর কিছু নিন্দা করিয়াছেন, হোক তাঁর পরিবার, অমন রাঁধুনীটা নিয়ে যাওয়া তাঁর কিছু ভাল হয় নাই।"

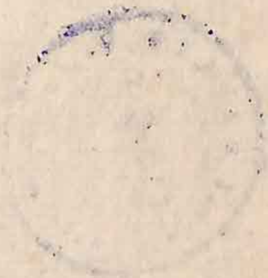
কর্তা গৃহিণীকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি ছল-ছুতা করিয়া সুন্দর রাঁধুনীটাকে বিদায় করিয়া দিয়াছ।"

বলা বাহুল্য যে, ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণীটি ও অন্যান্য ভৃত্যদিগের জন্য কিছু কিছু পাঠাইয়া দিলাম।

তার পর সুভাষিণীর সঙ্গে আর একবার মাত্র দেখা হইয়াছিল। তার কন্যার বিবাহের সময় বিশেষ অনুরোধে স্বামী আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু আর যাওয়া ঘটে নাই। আমি সুভাষিণীকে ভুলি নাই। ইহজন্মে ভুলিব না। সুভাষিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম না।

সমাপ্ত





এই সংস্করণের বিশেষত্ব ঃ

★ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা কোথাও ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই।

★ গল্পাংশ থেকে শুধু ছোটদের অনুপযোগী অংশই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

★ ছোটদের দুর্বোধ্য দুরূহ শব্দ বর্জিত হইয়াছে।

★ গল্পাংশ ক্ষুণ্ণ করিয়া পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা কমানো হয় না।

★ বর্তমান বাংলা কিশোর-সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখক প্রতিটি খণ্ড সযত্নে সম্পাদনা করিয়াছেন।

★ প্রতিটি গ্রন্থ সচিত্র। ছবিগুলি আঁকিয়াছেন বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

এই সংস্করণের যে কোন গ্রন্থ নিঃসংশয়েছোটদের হাতে তুলিয়া দেওয়া যায়।

আটখানি বাহির হইয়াছে ঃ

আনন্দমঠ
কপালকুণ্ডলা
দেবী চৌধুরাণী
চন্দ্রশেখর
রাজসিংহ
মৃণালিনী
রাধারাণী ও যুগলাঙ্গুরীয়
ইন্দিরা

প্রতি খণ্ডের দাম এক টাকা মাত্র